দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস

মরণোত্তম

সাদাত হোসাইন

আজিজ মাস্টার ঢাকায় যাচ্ছেন। তিনি দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ঢাকায় যাচ্ছেন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের কথা কেউ জানে না। দীর্ঘ বাস যাত্রায় তার খানিক ঝিমুনির মতো এসেছে। ঝিমুনিতে তিনি একটা স্বপ্নও দেখে ফেলেছেন। স্বপ্নে তার মৃত বাবা দবির খাঁ তাকে বলছেন, তুই ঢাকায় যাচ্ছিস কেন ?

স্কুল বাঁচাতে।

ঢাকায় গেলে স্কুল বাঁচবে ?

চেষ্টা করতে দোষ কী!

চেষ্টা করতে দোষ নাই। কিন্তু অযথা চেষ্টায় সময় নষ্ট। কোনো চেষ্টাই অযথা না আব্বা।

অলংকরণ : উত্তম সেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই অযথা। এই যে বাসে করে ঢাকায় যাচ্ছিস, এখন এই বাস যদি রাস্তার মাঝখানে বন্ধ হয়ে যায়। আর তুই একা যদি সেই বাস ঠেলে ঠেলে ঢাকায় নেওয়ার চেষ্টা করিস, তাহলে সেই চেষ্টা অযথা হবে না ?

আজিজ মাস্টার জবাব দিলেন না। স্বপ্নে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের মাঠে। টাকাপয়সার অভাবে স্কুল প্রায় বন্ধ হতে চললেও মাঠভর্তি ছেলেপুলে। আজিজ মাস্টার তাদের ফুটবল কিনে দিয়েছেন। বিকেল হতেই তারা ফুটবল নিয়ে মাঠে নেমে যায়। চিৎকার চেঁচামেচি করে। এই দৃশ্য দেখতেও আজিজ মাস্টারের ভালো লাগে। স্কুলের টিনের বেড়া কোনোরকমে টিকে থাকলেও চালগুলো এখানে ওখানে ফুটো হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলেই ঝরঝর করে পানি পড়ে। 'দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাই স্কুল' লেখা সাইনবোর্ডখানার রঙও এখানে সেখানে উঠে গেছে। দবির খাঁ হয়ে গেছে 'দাবর খা'। এই এলাকায় দাবর শব্দের অর্থ ধাওয়া। ফলে আঞ্চলিকভাবে স্কুলের নাম হয়ে গেছে এখন 'ধাওয়া খা'। এই নিয়ে আড়ালে আবডালে লোকজন হাসাহাসি করে। আজিজ মাস্টার বুঝেও না বোঝার ভান করেন। তিনি চাইলেই নতুন ঝা চকচকে একখানা সাইনবোর্ড লাগাতে পারেন। কিন্তু যেই স্কুলে ক্লাস হয় না, শিক্ষক-শিক্ষার্থী আসে না, টাকার অভাবে স্কুলের টিনের চাল বেয়ে জল ঝরে, সেই স্কুলে চকচকে সাইনবোর্ড মানায় না। তিনি সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই আব্বা।

দবির খাঁ বললেন, সব চেষ্টাই চেষ্টা না। কিছু কিছু চেষ্টা আছে, যেগুলো অযথা সময় নষ্ট। শ্রম আর মেধার অপচয় বন্ধ বাসের মতো তোর ওই স্কুলও বন্ধ। স্কুলের ইঞ্জিন নষ্ট। তুই একা একা চেষ্টা করছিস সেই বাস কাঁধে ঠেলে চালাতে। কিন্তু এই কাজ একা সম্ভব না। এর আগেও তো কতবার স্কুলের কাজে ঢাকায় গিয়েছিস। কত নেতা ফেতা ধরেছিস। কাজ হয়েছে ? হয় নি। বরং মাঝখান থেকে ঢাকায় যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়া বাবদ পকেটের টাকা খরচ হয়েছে। হয় নি ?

এবার কাজ হবে।

কীভাবে ?

এবার স্কুল এমপিওভুক্তির দাবিতে আমি অনশন করব। আমরণ অনশন। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সাড়াশব্দ না করবে, দাবি মেনে না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অনশন ভাঙব না।

যদি তোর অনশন ভাঙাতে কেউ না আসে ? তাহলে কি সত্যি সত্যিই অনশন করে না খেয়ে মারা যাবি ?

মারা যাব কেন ? কেউ না কেউ আসবেই। একজন বৃদ্ধ মানুষ, পেশায় স্কুলশিক্ষক, তিনি ঘোষণা দিয়ে দিনের পর দিন না খেয়ে প্রকাশ্যে মারা যাবেন, আর এই নিয়ে কেউ কিছু বলবে না ? এমন হবে ? কখনোই না। কেউ না কেউ অবশ্যই আসবে। দেখবেন এই নিয়ে চারদিকে একটা হইচই পড়ে যাবে। পেপার পত্রিকায় খবর ছাপা হবে। টেলিভশন সাংবাদিকরা চলে আসবে। আর আপনি তো জানেন না, আজকাল ফেসবুক নামে মারাত্মক এক জিনিস এসেছে। আলাদিনের দৈত্যের মতো তার ব্যাপারস্যাপার। তার পক্ষে সবই সম্ভব। এই খবর যদি একবার ফেসবুকে ছড়িয়ে যায়, দেখবেন চারদিকে মানুষের ভেতর একটা হইহই কাণ্ড রই রই ব্যাপার ঘটে যাবে।

দবির খাঁ চিন্তিত গলায় বললেন, কী জানি! আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বল তো ?

কী কথা ?

তুই কি শুধু স্কুলের দাবি নিয়েই যাচ্ছিস ? নাকি ভেতরে ভেতরে তোর অন্য কোনো প্ল্যানও আছে ?

অন্য কী প্ল্যান ?

দবির খাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোরে তো আমি চিনি। আর চিনি বলেই এত দুশ্চিন্তা। একবার কোনো কিছু মাথায় ঢুকলে তো আর সেই জিনিস তোর মাথা থেকে বের হবে না!

আজিজ মাস্টার জবাব দিলেন না। দবির খাঁ-ই আবার বললেন, এক কাজ করলে কেমন হয় ?

কী কাজ ?

তুই নুরুল মোল্লার নামে স্কুলটা দিয়ে দে। সে চেয়ারম্যান মানুষ। স্কুলের সভাপতিও। সামনে এমপি ইলেকশনও করতে পারে। তার নামে স্কুলের নাম হলেই দেখবি স্কুল এমপিওভুক্ত করার জন্য সে উঠে পড়ে লাগবে!

আজিজ মাস্টার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তিনি দেখলেন মাঠ থেকে জোরালো শটে ফুটবলটা সরাসরি তার কপাল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। তিনি শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করেছিলেন সরে আসতে। কিন্তু পারলেন না। বলটা তার কপালে আঘাত করল। প্রবল ঝাঁকিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। বিকট শব্দে বাসের ব্রেক কষেছে ড্রাইভার। আজিজ মাস্টারের মাথা ঠুকে গেছে সামনের সিটের সঙ্গে। পেছন থেকে ড্রাইভারের উদ্দেশে গাল বকলো কাঁচা ঘুম ভাঙা যাত্রীরা।

আজিজ মাস্টার অবশ্য কিছু বললেন না। তিনি চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তার কোলে একখানা ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর ভাঁজ করা একখানা ব্যানার।

আজিজ মাস্টার বসে আছেন প্রেস ক্লাবের বাইরে। মূল গেট থেকে খানিক দূরে প্রেস ক্লাবের দেয়াল ঘেঁষে ফুটপাতে মাদুর বিছিয়ে বসেছেন তিনি। তার আশপাশে কিছু লোক জড়ো হয়েছে। এদের বেশির ভাগেরই ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, এরা বড়সড় কোনো মজা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। আজিজ মাস্টার অবশ্য বুঝতে না, এখানে মজা পাওয়ার মতো কী আছে! বিষয়টি এমন না যে তিনি এখানে কোনো হাস্যরসাত্মক কর্মকাণ্ড করছেন। স্ট্রিট ম্যাজিশিয়ানদের মতো রাস্তার পাশে কোনো ম্যাজিকও দেখাচ্ছেন না। এমনকি ক্যানভাসারদের মতো আদি রসাত্মক কথাবার্তা বলে কোনো গোপন রোগের ঔষুধও বিক্রি করছেন না। তিনি অনশন করছেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, তার পেছনে একখানা ছোট ব্ল্যাকবোর্ড। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা 'ঐতিহ্যবাহী দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের এমপিওভুক্তির দাবিতে আমরণ অনশন। অনশনে— প্রধান শিক্ষক আজিজুর রহমান।'

এখানে হাসি-তামাশার মতো কোনো ব্যাপার নেই। একজন স্কুলশিক্ষক তার স্কুলের এমপিওভুক্তির দাবিতে আমরণ অনশন করছেন, এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কী হতে পারে! কিন্তু জড়ো হওয়া লোকজনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তারা কোনো সার্কাস দেখতে এসেছে। সার্কাসে দারুণ মজার মজার ঘটনা ঘটছে। আরও মজার ঘটনা ঘটনার অপেক্ষায় তারা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে।

আজিজ মাস্টার অবশ্য কোনো কথা বললেন না। তিনি তার পিঠের নিচের ব্যাগখানা খানিক উপরে তুলে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলেন। তার মাথা ঠেকে আছে পেছনের ব্ল্যাকবোর্ডে। এই ব্ল্যাকবোর্ড তিনি তার স্কুলঘর থেকে বাসের লকারে করে বয়ে এনেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিড় থেকে খানিক দূরে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে চশমা। মাথায় লম্বা চুল। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। সে অন্যদের মতো উশখুশ করছে না বা ভিড়ের মধ্যেও ঢুকছে না। খানিকটা দূরে একা দাঁড়িয়ে আছে। এত এত মানুষের ভিড়েও ছেলেটা আলাদা করেই দৃষ্টি কাড়ল আজিজ মাস্টারের। বার কয়েক চোখাচোখিও হলো। হঠাৎ কী মনে করে সোজা আজিজ মাস্টারের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ছেলেটা। আজিজ মাস্টার খানিক অবাকই হলেন। ছেলেটা ধীর পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, স্যার কি একাই এসেছেন ? নাকি সাথে কেউ আছে ?

আজিজ মাস্টার বুঝতে পারছেন না, এর প্রশ্নের উত্তরে তার কিছু বলা উচিত কি না! তিনি নিরুত্তর রইলেন। ছেলেটা বলল, আপনার পাশে একটু বসি স্যার ?

আজিজ মাস্টার এবারও জবাব দিলেন না। তবে ছেলেটা তার জবাবের অপেক্ষাও করল না। সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আজিজ মাস্টারের পাশে বসে পড়ল। তারপর আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল। আজিজ মাস্টার যুগপৎ অবাক এবং আশাহত হলেন। তাঁর মতো একজন বৃদ্ধ স্কুলশিক্ষকের সামনে এই বয়সের একটা ছেলে এভাবে সিগারেট ধরাবে এটি তিনি আশা করেন নি। ছেলেটি অবশ্য আজিজ মাস্টারকে আরও অবাক করে দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল। তারপর বলল, চলবে নাকি স্যার ? ব্র্যান্ড ভালো না হলেও এই সিগারেটটা খেয়ে মজা। টেস্ট করে দেখতে পারেন।

আজিজ মাস্টারের হতভম্ব ভাবটা এখন রাগে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু তিনি কী বলবেন, কী করবেন, সেটি বুঝে উঠতে পারছেন না।

ছেলেটা গলগল করে মুখভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে বলল, অনশন কি একাই করতেছেন ?

আজিজ মাস্টার কিছু বলার আগেই সে নিজেই আবার বলল, অনশন করলে সাথে লোকজন থাকতে হয়। একা একা অনশন হয় না।

আজিজ মাস্টার বললেন, কে আপনি ? আপনার পরিচয় কী ?

ছেলেটা তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, অনশন করতে হলে টিভি ক্যামেরা, পেপার পত্রিকার সাথে ভালো যোগাযোগ আছে, এমন লোকজন লাগে। আছে আপনার এমন লোকজন ?

আজিজ মাস্টার সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে মৃদু কণ্ঠে বললেন, না।

তাহলে তো হবে না স্যার। ওইরকম কিছু লোকজন থাকলে তারা খবর দিয়ে সাংবাদিক-টাংবাদিক নিয়ে আসবে। সাংবাদিক ছাড়া অনশন করে কোনো লাভ নাই। আপনিই বলেন, সাংবাদিকেরা যদি কোনো খবর না করে, তাহলে সেই অনশনের কথা কেউ কোনোদিন জানবে ?

উঁহু। আজিজ মাস্টার ছেলেটার কথা শুনে যেন খানিক আগ্রহী হলেন।

ছেলেটা বলল, সাংবাদিকদের কিছু চা-বিস্কুটও খাওয়াতে হবে। যাওয়ার সময় হাতের ফাঁকে সামান্য টাকাপয়সা গুঁজে দিতে হবে। এইটারে আবার ঘুষ ভাইবেন না। এইটা হলো তাদের আসা যাওয়ার খরচ। ভাড়া বা নিজেদের গাড়ির তেলের খরচ। নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে তারা আপনার সংবাদ কভার করতে কেন আসবে বলেন ? সব কিছুরই তো একটা সিস্টেম আছে, আছে না ?

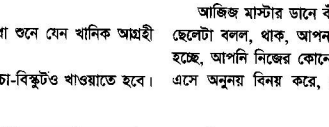

আজিজ মাস্টার জবাব দিলেন না। তিনি তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। বিশাল রেইনট্রি গাছের ফাঁক দিয়ে শরতের পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশে চক্রাকারে চিল উড়ছে। ঢাকা শহরে এই সময়ে এভাবে চিল উড়তে দেখবেন, তিনি ভাবেন নি।

ছেলেটা খানিক কাছে এসে বলল, শোনেন স্যার, এসব না হলে কিন্তু এই অনশন-টনশন করে কোনো লাভ নাই।

আজিজ মাস্টার ছেলেটার দিকে তাকালেন না। তবে আড়চোখে তিনি তার উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করছেন। সে বলল, আর যদি ভাবেন স্রেফ লোক দেখানোর জন্য আমরণ অনশনের অভিনয় করছেন, আসলে আমরণ অনশন করবেন না, তারপরও কিন্তু এসব কিছু লাগবে। বিশেষ করে নিজের লোকজন তো লাগবেই।

আজিজ মাস্টার এবার মুখ ফিরিয়ে সরাসরি ছেলেটার চোখে তাকালেন। ছেলেটা মৃদু হেসে বলল, তখন জোর করে অনশন ভাঙানোর অভিনয় করার জন্য লোকজন লাগবে। এই ধরেন আপনি একদম অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে যাওয়ার অভিনয় করবেন। তখন আপনার জন্য হাসপাতাল থেকে ডাক্তার নিয়ে আসার জন্য লোক লাগবে। মিছেমিছি স্যালাইন লাগানোর জন্য লোক লাগবে। তারপর শেষ মুহূর্তে এসে জোরজবরদস্তি করে জুস-টুস খাইয়ে তারা আপনার অনশন ভাঙাবে। বুঝলেন ?

আজিজ মাস্টার তাকিয়েই আছেন। উদ্দেশ্য যা-ই হোক, ছেলেটাকে এখন তার ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। তিনি কৌতূহলী ভঙ্গিতে তাকালেন। ছেলেটা বলল, আর যদি সত্যি সত্যিই আমরণ অনশন করে থাকেন, মানে দাবি-দাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত সত্যি সত্যিই অনশন করতে চান তাহলে কিন্তু সত্যি সত্যি না খেয়ে মরতে হবে।

কেন ? আজিজ মাস্টার এবার আর জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলেন না। ছেলেটা সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফিল্টারটা দূরে ছুড়ে মারল। তারপর বলল, কারণ এইসব অনশন টনশনে কারও কিছু যায় আসে না। আপনি মরলে কার কী ? এই দেশে রোজ কত শত শত মানুষ মরে, তাতে কার কী যায় আসে ? এই দেশে কি মানুষের অভাব আছে ? এখানে কেউই আপনার অনশন ভাঙাতে আসবে না। রাস্তার মানুষও না। তারা শুধু শুধু ঝামেলায় জড়াতে চাইবে না। তারা ভাববে এখানে এসে আবার কি-না-কী ঝামেলায় পড়বে। দরকার কী! এমনকি এই যে এখন যারা আপনার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, এরাও না। এরা বরং চোখে মুখে আনন্দ নিয়ে আপনার মৃত্যু দৃশ্য দেখবে। কেউ কেউ ছবি তুলবে, ভিডিও করবে। সেইদৃশ্য ফেসবুকে লাইভ হবে। লাইভ ডেথ। সেই ভিডিও ভাইরাল হবে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। বুঝলেন ?

আজিজ মাস্টার ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়ালেন। তিনি বোঝেন নি। ছেলেটা বলল, থাক, আপনার আর বুঝতে হবে না। তবে সমস্যা হচ্ছে, আপনি নিজের কোনো লোকজন নিয়ে আসেন নাই যে তারা এসে অনুনয় বিনয় করে, জোর-জবরদস্তি করে আপনার অনশন ভাঙাবে।

আজিজ মাস্টার তাকিয়েই আছেন। ছেলেটা বলল, আর আপনার দাবিদাওয়া কেউ মানতে আসবে না। এইটা সিওর। তবে সত্যি সত্যিই যদি অনশন করে মরে যান, তখন হয়তো কিছু সাংবাদিক খোঁজখবর নিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবে। ভাগ্য ভালো হলে পত্রিকার কোনো কোনায় দুয়েকটা সংবাদ-টংবাদও হতে পারে। সান্ত্বনা বলতে এটুকুই।

আজিজ মাস্টার ছেলেটার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। এতক্ষণে তার মনে হলো ছেলেটা কবি-লেখক গোছের কিছু একটা হবে। তার কাঁধের শান্তিনিকেতনি ঝোলার ভেতর থেকে কাগজ-কলমও উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু কবি-লেখকেরা কি আসলেই এমন হয় ? তাদের একপলক দেখেই বোঝা যায় তারা কবি-লেখক ? আজিজ মাস্টার অবশ্য শুনেছেন, আজকাল শহরে কবি-লেখকরা আর আগের মতো এমন বেশভূষায় ঘুরে বেড়ান না। তারা এখন জিন্স, টিশার্ট, কোট-টাই পরেও হরদম ঘুরে বেড়ান।

ছেলেটা আজিজ মাস্টারের মুখের কাছে মুখ এনে প্রায় ফিসফিস করে বলল, এই দেশে অনশন-মানব বন্ধন করে কোনো লাভ হয়েছে কোনোদিন ? কোনো দাবি-দাওয়া আদায় হয়েছে ? হয় নাই। কারণ, ওগুলো এই দেশের জিনিস না। ওগুলা হলো শিক্ষিত, উন্নত দেশের জিনিস। এই দেশের দাবি আদায়ের জিনিস হলো জ্বালাও, পোড়াও, ভাঙচুর, হরতাল-অবরোধ। কথায় আছে না, যেমন ওল, তেমন বাঘা তেঁতুল। এটাই আসল কথা। এইসব মানব বন্ধন-ফন্দন এই দেশে চলে না। মানুষ ভাবে মশকরা হচ্ছে। তারা বিষয়টাতে বিনোদন পায়, আনন্দ পায়, আন্দোলন পায় না। আমাদের দেশের শাসকশ্রেণি হলো লোহা। আর লোহা গলাতে লাগে আগুন। পানিতে লোহা গলে না, গলে আগুনে। যেই জিনিসের যেই নিয়ম।

আজিজ মাস্টার এবার সরাসরি প্রশ্ন করলেন, আপনার পরিচিত কোনো সাংবাদিক আছে ?

দু-চারজন আছে। তবে তাদের দিয়ে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

কেন ?

কারণ তারা হচ্ছে অনলাইন পত্রিকার সাংবাদিক। ঢাকা শহরে এখন যে পরিমাণ কাক, সেই পরিমাণ অনলাইন পত্রিকা। এদের বেশির ভাগেরই কোনো সাংবাদিক থাকে না। নিজেই সম্পাদক, নিজেই সাংবাদিক। এরা বড় বড় পত্রিকার নিউজ কপি করে হুবহু ছাপায়। ফলে এদের নিজস্ব নিউজ কেউ পড়ে না। না পড়ার অবশ্য কারণও আছে। এদের নিজস্ব নিউজ মানেই যৌন সুড়সুড়ি মার্কা খবর। মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বা উত্তেজক হেডলাইন। হেডলাইনের পাশে লেখা থাকে ভিডিওসহ।

আজকাল কি পত্রিকায়ও ভিডিও দেখা যায় ?

আরও অনেক কিছুই দেখা যায়, সেসব আপনি বুঝবেন না। এবার আসল কথায় আসেন।

জি। আজিজ মাস্টার যেন হালে কিছুটা পানি ফিরে পাচ্ছেন। তার ধারণা, এই ছেলে তাকে বুদ্ধি-পরামর্শ কিছু দিলেও দিতে পারে। নিজের বোধবুদ্ধি নিয়ে খুব একটা আত্মবিশ্বাসী নন তিনি। আগে তা যাও ছিলেন, এখন দিন যত যাচ্ছে, নিজের প্রতি আস্থা তত কমছে আজিজ মাস্টারের। চারপাশের মানুষ, পৃথিবী কেমন পাল্টে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না তিনি।

প্রেস ক্লাবের সামনে এসে এই অনশন করার বুদ্ধিও তার নিজের না। এই বুদ্ধি আরও বছরখানেক আগে তাকে দিয়েছিল তার স্কুলের অবৈতনিক বাংলা শিক্ষক রফিকুল ইসলাম। রফিকুল পড়াশোনা করেছে তিতুমির কলেজে বাংলায়। তার জীবনের 'এইম ইন লাইফ' বলতে যা বোঝায়, তা হলো গ্রামের কোনো স্কুলে গিয়ে শিক্ষকতা করা। কোমলমতি ছেলেমেয়েদের সে তার শিক্ষায়-আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু তার সেই ইচ্ছে পূরণ হলো না।

মাস্টার্স পাশ করার পরও কোনো ভালো স্কুল-কলেজে সে চাকরি-বাকরি জোটাতে পারল না। আজকাল স্কুল-কলেজে চাকরি পেতে হলে সার্টিফিকেট ছাড়াও আরও নানান কিছু লাগে। কিন্তু সেসব কিছুই তার নেই।

রফিকুলের সঙ্গে আজিজ মাস্টারের পরিচয়ের ঘটনা খুবই অদ্ভুত। আজিজ মাস্টার ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। আবহাওয়া খারাপ। আরিচা ফেরিঘাট থেকে ফেরিতে উঠতেই শুরু হলো তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। একই ফেরিতে ফিরছিল রফিকুলও। তার বাড়ি খুলনায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝড়ো হাওয়া থেমে গেলেও বৃষ্টি আর থামল না। আজিজ মাস্টারের হাতে ছাতা। তিনি ছাতা মাথায় ফেরির রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালেন। বিস্তৃত নদীর জলে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির অজস্র ফোঁটা। ক্রমশই ধূসর হয়ে উঠছে দূরের দৃশ্য। ঠিক এই মুহূর্তে ছেলেটাকে চোখে পড়ল তার। রেলিংয়ের শেষ প্রান্তে একা একা দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বৃষ্টিতে ভিজছে রফিকুল। তার পরনে ইস্ত্রি করা আকাশি রঙের শার্ট, কালো প্যান্ট। কাঁধে ব্যাগ। কিন্তু কোনোদিকে কোনো খেয়াল নেই তার। সে আনমনে নদীর দিকে তাকিয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। তবে তার তাকানোর ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আসলে কিছুই দেখছে না সে।

আজিজ মাস্টার ভারি অবাক হলেন। তিনি খানিক ইতস্তত করে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলেন। কথাও বললেন। রফিকুল তখন মানিকগঞ্জে এক স্কুলে ইন্টারভিউ দিয়ে বাড়ি ফিরছে। ইন্টারভিউর ফলাফল সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার চাকরি হয় নি। রফিকুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার আর সে বাড়ি ফিরে যাবে না। আজিজ মাস্টার সব শুনে বললেন, তাহলে কোথায় যাবে তুমি ?

রফিকুল উদাস গলায় বলল, জানি না।

আজিজ মাস্টার তখনই প্রস্তাবটা দেন। দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাই স্কুলে শিক্ষক সংকট। বিনা বেতনে কে-ই বা আর কাজ করতে চায় ? এই অবস্থায় রফিকুলের মতো কাউকে পেলে মন্দ হয় না। তিনি সঙ্কোচ নিয়ে হলেও রফিকুলকে প্রস্তাবটা দিলেন, আপাতত শুধু থাকা আর খাওয়ার ব্যবস্থাটা তিনি করতে পারবেন। বাদ-বাকি স্কুল এমপিওভুক্ত হলে দেখা যাবে। রফিকুল এক কথায় রাজি হয়ে গেল। সেদিনই রফিকুলকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন আজিজ মাস্টার। সে দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের বাংলা শিক্ষক হিসেবে বিনা বেতনে চাকুরি পেয়ে গেল। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য হলো আজিজ মাস্টারের বাড়িতেই।

আজিজ মাস্টারের তিন মেয়ে। ছেলে নেই। বড় মেয়ে ঝুমুরকে বিয়ে দিয়েছেন। মেজো মেয়ে রুমু এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। ছোট মেয়ে কুমু পড়ে ক্লাস টেন-এ। এই বাড়িতে রফিকুলের বয়সী ছেলে রাখা আর খাল কেটে কুমির আনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আজিজ মাস্টার তারপরও রাখলেন। রাখার অন্য কারণও অবশ্য আছে। ফেরি থেকেই রফিকুলের সঙ্গে তার কথাবার্তা জমে উঠল। রফিকুল স্বল্পভাষী হলেও সে কথা বলে খুব গুছিয়ে, হিসেব নিকেশ করে। স্কুলের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে তার সঙ্গে নানান কথাবার্তাও হলো। রফিকুলের আগ্রহ দেখে আজিজ মাস্টারের ভালো লেগে গেল। এই ছেলেটা সঙ্গে থাকলে স্কুল-বিষয়ক

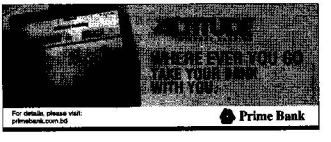

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

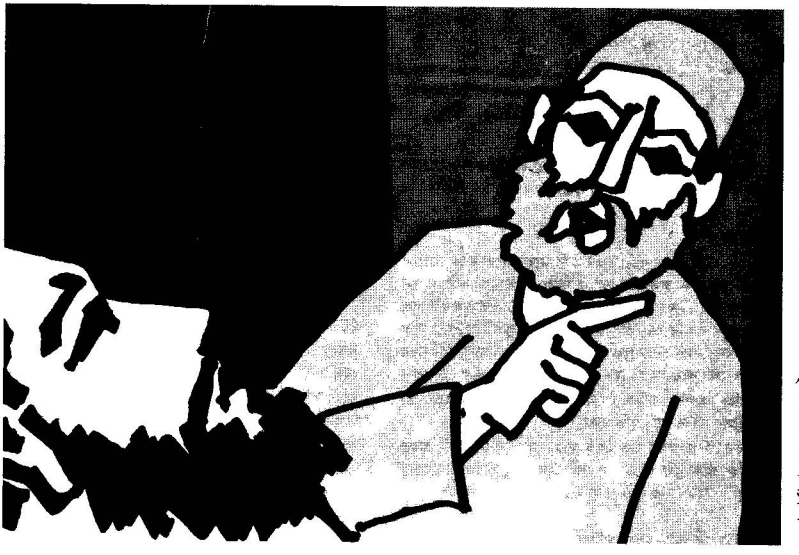

নানান শলাপরামর্শ তিনি করতে পারবেন। কে জানে, কাকে দিয়ে কখন কোন উপকার হয়ে যায়!

সেই রফিকুলের পরামর্শেই তিনি ঢাকা এসেছেন। তবে রফিকুল তাকে এই বুদ্ধিটা দিয়েছিল আরও বছরখানেক আগে। বিষয়টাতে তখন গুরুত্ব দেন নি আজিজ মাস্টার। বুদ্ধিও পছন্দ হয় নি। ছেলেমানুষী মনে হয়েছে। তা ছাড়া, তিনি নিজে তো জানেন, অনশনটা স্রেফ হুমকি, লোকদেখানো। না খেয়ে তো আর সত্যি সত্যিই কেউ মরে যায় না। তিনিও যাবেন না। মাঝখান থেকে অনশনের অভিনয় করে কিছু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবেন কেবল। কিন্তু স্কুল নিয়ে এটা করতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত যদি তার এই অনশন নিয়ে কেউ কোনো আগ্রহ না দেখায়, তখন ? তখন বিষয়টি রীতিমতো হাস্যকর হয়ে যাবে। দাবি আদায় না হলে, সত্যি সত্যিই তো আর না খেয়ে মারা যাবেন না তিনি!

এরপর বহু সময় চলে গেছে। বিষয়টা একভাবে ভুলেই গিয়েছিল রফিকুল। কিন্তু দিন দুই আগে রফিকুলকে ডেকে আজিজ মাস্টার বললেন, মাস্টার সাব, আমি ঢাকা যাব।

হঠাৎ ঢাকা কেন যাবেন স্যার ?

তুমি না বলছিলা, প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে অনশন করতে!

সে তো বহু আগে! তখন তো আইডিয়া আপনার পছন্দ হয় নাই!

তখন হয় নাই বলে যে আর কখনো হতে পারবে না, এমন তো কোনো কথা নাই। আছে ? আজিজ মাস্টার বিরক্ত গলায় বললেন।

জি না।

তাহলে তর্ক বন্ধ করে, কীভাবে কী করব, সেই বিষয়ে ধারণা দাও।

রফিকুল খানিক ধারণা দিলেও পুরো বিষয়টি নিয়েই সে এক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল। ফলে সে চাইছিল, সে নিজেও আজিজ মাস্টারের সঙ্গে ঢাকায় আসতে। কিন্তু আজিজ মাস্টার তাতে রাজি হন নি। মাস কয়েক আগে এলাকায় এক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর থেকেই চারদিকে একটা থমথমে অবস্থা। এই সময়ে বাড়িতে একটা পুরুষমানুষ থাকা দরকার। তাঁর স্ত্রী শাফিয়া বেগমও অবশ্য আজিজ মাস্টারকে একা ছাড়তে চান নি। কিন্তু আজিজ মাস্টার কারও কথাই শোনেন নি। তিনি গ্রামের কাউকে কিছু না বুঝতে দিয়ে গতকাল ভোরেই চুপিচুপি ঢাকা চলে এসেছেন। কিন্তু এখানে এসে এখন মনে হচ্ছে, এভাবে ঝোঁকের মাথায় একা একা চলে আসা ঠিক হয় নি। কোনোকিছুরই আগামাথা বুঝছেন না তিনি। সঙ্গে জানাশোনা কেউ থাকলে আসলেই ভালো হতো।

কাঁধে ঝোলাওয়ালা কবি কবি চেহারার ছেলেটা আবার বলল, কী ব্যাপার স্যার ? আপনি তো কিছু বলছেন না ? এরকম ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলে চলবে ? আপনার প্ল্যান-পরিকল্পনা কী সেটা বলেন।

আজিজ মাস্টার চমকে যাওয়া গলায় বললেন, কোনো প্ল্যান পরিকল্পনা তো নেই।

প্ল্যান-পরিকল্পনা ছাড়া কেউ অনশন করে ?

তা তো জানি না! এর আগে তো কখনো অনশন করি নাই আমি।

এটা অবশ্য ঠিক কথা। তবে স্যার, আপনি সত্যি করে একটা কথা বলবেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী কথা বলব ?

আপনার আসল উদ্দেশ্য কী ?

আসল উদ্দেশ্য কী মানে ?

না মানে, অনশন করার নাটকটা কেন করছেন ?

নাটক করছি ? আজিজ মাস্টার রীতিমতো অপমানিত বোধ করলেন।

নয়তো কী ? স্কুল এমপিওভুক্তির দাবিতে এভাবে একা একা কেউ কোনোদিন অনশন করেছে ? আর করলেও এভাবে কি দাবি আদায় হয় ?

হয় না ?

ধরেন হলো। তো এভাবে যদি দাবি আদায় হতে থাকে, তাহলে তো যে-কেউ যখন তখন, যে-কোনো দাবিতে রাস্তাঘাটে বসে অনশন করা শুরু করে দিবে। তখন ? দেখা গেল কেউ একজন একটা স্কুল খুলেই এসে অনশন করা শুরু করা দিল, তার স্কুলটি সরকারি হতে হবে। তখন কি সরকারের পক্ষ থেকে সেই সবার সব দাবি পূরণ সম্ভব হবে ? অনশন করে সব শিক্ষকেরা মরে গেলেও তো সম্ভব হবে না।

আজিজ মাস্টার খানিক চুপ করে থেকে বললেন, তা হবে না। কিন্তু আমার দাবির পক্ষে যুক্তি আছে।

সবার দাবির পক্ষেই যুক্তি থাকে স্যার। যে লোক চুরি করে, তারও তার চুরির পক্ষে যুক্তি থাকে। যে লোক খুন করে, তারও তার খুনের পক্ষে যুক্তি থাকে। কিন্তু যুক্তি থাকা মানেই সেটা সঠিক বা গ্রহণযোগ্য না।

কথাটা খুব পছন্দ হলো আজিজ মাস্টারের। ছেলেটার ভাবভঙ্গি, পোশাক-আশাক দেখে মনে মনে যতটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য তিনি করেছিলেন, এখন তা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। আজিজ মাস্টার বললেন, আমার স্কুল এমপিওভুক্ত না হওয়ার পেছনে অন্য কারণও আছে। গুরুতর কারণ। সেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাজনৈতিক। একবার তো সবকিছু একদম ফাইনাল হয়েই গিয়েছিল, কিন্তু এই কারণেই শেষ মুহূর্তে হলো না।

হবে কীভাবে বলেন ? আপনার নিজের ইচ্ছাই তো শক্ত না।

ইচ্ছা শক্ত না মানে ? আজিজ মাস্টার খুবই অবাক হলেন।

মানে যেই দাবির কথা মানুষ চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখে, সেই দাবি তো পূরণ হওয়ার কথা না।

আজিজ মাস্টার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ফিরে তাকালেন। দীর্ঘ সময়ে তাকিয়ে থেকেও তিনি সমস্যাটা ধরতে পারলেন না। কোথাও কি কোনো ভুল হয়েছে ? বানান বা বাক্যে ?

ছেলেটা বলল, ব্ল্যাকবোর্ডে মানুষ কী লেখে জানেন ?

কী ?

যা মুছে ফেলতে হবে তা। মানে এরপর সেখানে অন্য কিছুও লিখতে হবে। এখন বলেন আপনার আসল উদ্দেশ্য কী ?

আজিজ মাস্টার সঙ্গে সঙ্গেই কথা বললেন না। তবে ছেলেটার চোখের দিকে তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এতক্ষণে তিনি লক্ষ করলেন ছেলেটার চোখজোড়া ঝকঝকে। বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি উল্টো প্রশ্ন করলেন, আপনার নাম কী ?

আসাদ।

কী করেন ?

কবিতা লিখি।

তার মানে কবি ?

বলতেও পারেন। নাও বলতে পারেন। তবে লোকে অকবিও বলে। তা ছাড়া অনেক দিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও কিছু লিখতে পারছি না। কবিতা আসছে না।

অকবি আবার কী জিনিস ?

যে কবিতা লেখার চেষ্টা করে, কিন্তু হয় না বা লিখতে পারে না, সে হলো অকবি।

আপনার কবিতা হয় না ?

মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, হয় না।

তাহলে তো আপনার মাঝে মাঝে কবি, আর মাঝে মাঝে অকবি হওয়ার কথা ছিল।

আমারও তা-ই মনে হয়। কিন্তু আমার সমসাময়িক আর সব কবিদের ধারণা আমার কবিতা কিছুই হয় না। সব গার্বেজ।

তাদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?

তাদের সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।

কেন ?

কারণ তাদের লেখা আমি পড়ি না।

পড়েন না কেন ?

পড়ার যোগ্য মনে করি না।

কেন যোগ্য মনে করেন না ? না পড়লে যোগ্য-অযোগ্য বুঝবেন কী করে! আগে তো পড়তে হবে। তারপর না ভাবতে পারবেন।

তাদের নিয়ে আমি ভাবতেও চাই না। ভাবিও না।

ভাবেন না কেন ?

সময় নষ্ট। কারণ এরা লেখার চেয়ে সারাক্ষণ অন্য কবি-লেখকদের সমালোচনা করা, খিস্তি-খেউড় নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে।

কিন্তু আপনি না ভাবলে লিখবেন কী করে ?

তাদের নিয়ে ভাবি না মানে যে আমি কিছু নিয়েই ভাবি না, তা তো নয়!

আচ্ছা, তাহলে আপনি কাদের নিয়ে ভাবেন ?

আমি ভাবি নিজেকে নিয়ে। নিজেকে ঠিকভাবে চিনতে পারলেই সবাইকে চেনা যায়। লালন সাঁইয়ের গান আছে না, একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা।

আজিজ মাস্টারের হঠাৎ মনে হলো তিনি অযথা কথাবার্তা বলছেন। এসব কথাবার্তার সঙ্গে তার অনশনের কোনো সম্পর্ক নেই। শিক্ষকদের এই এক সমস্যা, তারা কারণে অকারণে শুধু কথা বলতে চায়। কোথায় তাঁর এখন নিজের কাজের কথা বলা উচিত, তা না করে তিনি এসব কী হাবিজাবি নিয়ে বসে সময় নষ্ট করছেন! আজিজ মাস্টার এবার কাজের কথায় এলেন, আমার কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

ঝেড়ে কাশা উচিত।

ঝেড়ে কাশা উচিত মানে ?

ঝেড়ে কাশা উচিত মানে, আসল ঘটনা কী সেটা খুলে বলা উচিত।

আপনার ধারণা আমি এই অনশন নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করছি ? মিথ্যে কথা বলছি ?

উঁহু, তা মনে হচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে, আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের কথা আপনি প্রথমেই কাউকে বলতে চাইছেন না।

এবার আজিজ মাস্টার সত্যি সত্যি বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন, আপনার কেন এমন মনে হচ্ছে ?

শোনেন স্যার, আমার প্রধান শখ মানুষ দেখা। রাত দিন আমি এই মানুষ দেখার জন্য ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াই। আমার ধারণা ছিল, এইভাবে মানুষ দেখলে আমি কবিতা লিখতে পারব। অনেক দিন পেরেছিও। কিন্তু হঠাৎ বেশ কিছুদিন হলো কিছুই লিখতে পারছি না। বুঝতে পারছি না, মানুষ দেখা শেষ হয়ে গেল কি আমার!

অন্য সব দেখা, সব পড়া একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মানুষ দেখা বা পড়া কখনো শেষ হবে না। কারণ মানুষ হলো অফুরন্ত গল্পের উৎস।

বাহ, দারুণ বলেছেন স্যার! তবে একটা কথা কি জানেন ? কবিতা লিখতে না পারলেও, এই দিনের পর দিন রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে মানুষ দেখতে দেখতে একটা লাভ আমার হয়েছে।

কী লাভ ?

আমি এখন অল্প-বিস্তর মানুষ চিনতে পারি। কিছুক্ষণ কারও দিকে তাকিয়ে থাকলেই তার হাবভাবে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ে যায়। আমি দীর্ঘ সময় রাস্তার ওই পাশে বসে বসে আপনাকে দেখছিলাম। দেখে আপনার সম্পর্কে খুব কৌতূহল তৈরি হলো। এইজন্যই আসা। আপনি আবার স্যার ভাববেন না যে আমার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আসলে আপনাকে আমার যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মানুষ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে দেখতে সাদাসিধে হলেও, আপনি মানুষটা খুব জেদি। আর এই জেদ আপনাকে মুহূর্তেই ভয়ঙ্করও বানিয়ে ফেলতে পারে।

আজিজ মাস্টার কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তাঁর প্রায় বছরের এই জীবনে এই প্রথম কেউ তাঁকে ভয়ংকর বলল। তিনি নিজে খুব ভালো করেই জানেন, তিনি মোটেই ভয়ংকর কোনো মানুষ না। বরং খুবই সাদাসিধে, নিরীহ গোছের গোবেচারা, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ তিনি। কারও কোনো সাত পাঁচে নেই। কোনো ঝামেলা পছন্দ করেন না। কিন্তু এই ছেলের কথা শুনে তার এখন মনে হচ্ছে, যদি সত্যি সত্যিই এই সহজ সাধারণ চেহারার আড়ালে ভয়ঙ্কর কোনো মানুষ হতে পারতেন তিনি! বিষয়টা তাহলে মন্দ হতো না। বরং ভালোই হতো। হঠাৎ হঠাৎ নানান তুঘলকি কর্মকাণ্ড করে লোকজনকে চমকে দেওয়া যেত। আজিজ মাস্টার আবিষ্কার করলেন, নিজেকে ভয়ঙ্কর ভাবতে ভালো লাগছে তার।

আসাদ বলল, এখন ঘটনা কী খুলে বলেন। এখানে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না। রাতে ঘুমাবেন বা আশপাশে কোথাও বাথরুম করতে যাবেন, এসে দেখবেন আপনার বিছানা বালিশ নেই। ব্যাগ নেই। ব্ল্যাকবোর্ডও নেই। এটা ঢাকা শহর। তবে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, ফুটপাতে নানান ধরনের হকারদের ব্যবসা থাকে। আনারস থেকে তরমুজ, শরবত, বাদাম, ছোলা মুড়ি থেকে গেঞ্জি, কসমেটিকস। এরা কিন্তু বেশিদিন আপনাকে সহ্য করবে না। তাদের ব্যবসায় আপনি ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন। আপনি না উঠলে আপনাকেসহই তারা হাপিশ করে দিবে।

আজিজ মাস্টার এবার খানিক ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বিচলিত গলায় বললেন, আমার দাবি আদায় না হোক, আমি অন্তত চাই আমার কথাগুলো, দাবি-দাওয়াগুলো লোকজনের কাছে পৌঁছাক। কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি পর্যন্ত যাক। কেউ একজন এসে আমার সাথে কথা বলুক। আমার কথা শুনুক।

আপনার এই স্কুলের কথা শুনে লোকজনের লাভ কী ? আর দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম, মিটিং, সেমিনার থাকে। তারা কেন আপনার এই তুচ্ছ বিষয়ে সময় নষ্ট করবে ?

এটা তুচ্ছ বিষয় ?

অবশ্যই তুচ্ছ বিষয়।

তাহলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী ?

এই ধরেন কোনো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেওয়া। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা। বিদেশ সফর। টেলিভিশন টক শোতে বকবক করা। এমন বহু বিষয় আছে।

কিন্তু আমাকে যে একজন বলেছিল, প্রেসক্লাবের সামনে যে-কোনো দাবিতে অনশন করলে সাংবাদিকেরা সংবাদ করে। তখন বিষয়টার একটা গুরুত্ব তৈরি হয়। মন্ত্রি-মিনিস্টাররা পর্যন্ত তখন বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয় ?

আসাদ বিরক্ত গলায় বলল, এতক্ষণ কী বললাম আপনাকে! সেজন্যও তো আপনার কিছু চেনা পরিচিত সাংবাদিক লাগবে। কিছু লোকজন লাগবে। যারা এইসব অ্যারেঞ্জ করে দিবে। আপনার আশপাশে বসার জন্যও দুয়েকজন লোক লাগবে। দাবি দাওয়া সংবলিত একটা ব্যানার হলে ভালো হতো। কিন্তু আপনি নিয়ে আসছেন ব্ল্যাকবোর্ড। এটা কিছু হলো ? সাথে একটা হ্যান্ড মাইক থাকলেও না হয় কিছু একটা করা যেত! আপনার সাথের লোকরা অন্তত কিছুক্ষণ পরপর মাইকে আপনার দাবিদাওয়া ঘোষণা দিতে পারত। সেই দাবিদাওয়া পূরণ না হলে আপনি কী করবেন সেগুলোও খানিক পরপর বলতে পারত। সবচেয়ে ভালো হতো, মাইকে যদি বলা যায়, আগামী তিন দিনের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আপনি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করবেন!

কী বলছেন আপনি! গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করব মানে ? আজিজ মাস্টার রীতিমতো আঁতকে উঠলেন।

ঠিকই বলছি। এ ছাড়া কারও টনক নড়বে না, বুঝলেন ? এই দেশে সবকিছু দরকার কড়া, কঠিন। কড়া ছাড়া দরজার কড়াও নড়ে না। আপনি এক কাজ করবেন। কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার ঘোষণা দিবেন। দেখবেন, এই খবর মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে যাবে।

আজিজ মাস্টারের এবার আসাদকে পাগল মনে হতে লাগল। এর ভাবভঙ্গি, কথাবার্তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এই খুব ভালো, গভীর কথা বলছে, আবার পরক্ষণে খুবই এলোমেলো, অসংলগ্ন, হাস্যকর কথাবার্তা বলছে। তিনি হতাশ গলায় বললেন, আপনি একটা কাজ করবেন আমার জন্য ?

কী কাজ ?

এই যে ভিড় করে আসা লোকগুলোকে একটু সরাবেন ?

কেন ?

এদের দেখেই আমার মাথা ধরে যাচ্ছে।

এদের দেখে মাথা ধরলে তো হবে না। বরং এরাই আপনার সম্পদ। যত ভিড়, তত বীর।

মানে ?

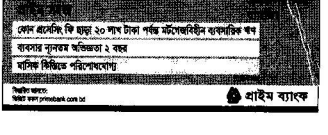

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে যত লোক জমবে, তত আপনার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে। আপনার গুরুত্ব বাড়বে। বুঝলেন ?

হুম! আজিজ মাস্টার আর কথা বললেন না। তার সত্যি সত্যিই মাথা ধরেছে। তবে আসাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে। এইসব জিনিসপত্র রেখে তিনি আশেপাশে কোথাও বাথরুম করতেও যেতে পারবেন না। ফিরে এসে যে আর কিছুই পাওয়া যাবে না, সে বিষয়ে তিনি এখন মোটামুটি নিশ্চিত। সন্ধ্যা পর্যন্ত আজিজ মাস্টার দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলেন। ততক্ষণে ভিড় অনেকটা কমে এসেছে। আসাদও চলে গেছে। সামনে জনা চারেক পুলিশ দেখে একফোঁটা তিনি উঠে গিয়ে বাথরুম সেরে এলেন। পুলিশের সামনে নিশ্চয়ই কেউ কিছু সরাতে সাহস করবে না। বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলেন, কেউ কিছু সরায়ও নি। তবে সেই জনাচারেক পুলিশ খানিক দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কথা বলছে তারা। আজিজ মাস্টারের হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, এই পুলিশগুলো তাকে নিয়েই কথা বলছে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু একমাত্র তিনিই। এ বিষয়ে আজিজ মাস্টার হঠাৎ নিশ্চিত হয়ে গেলেন। যদিও কারণটা তিনি বুঝতে পারছেন না।

নুরুল মোল্লা কি তাহলে কোনোভাবে এই ঢাকা পর্যন্তও তার প্রভাব খাটিয়ে লোকজন পাঠিয়ে দিয়েছে! এই ভয়টাই তিনি এতদিন করছিলেন। আর এ কারণেই চুপচাপ কাউকে কিছু না জানিয়েই একা একা ঢাকা চলে এসেছিলেন তিনি।

দুজন পুলিশ সদস্য হঠাৎ তার দিকে এগিয়ে এল। ল্যাম্পপোস্টের আলোতে একজনের নাম তিনি পড়তে পারলেন, সাগর।

সাগর অবশ্য কোনো ভদ্রতার ধার ধরল না। সে সরাসরি বলল, চাচা মিয়া, ঢাকায় থাকার জায়গা না থাকলে, ফুটপাতে ঘুমাবেন ভালো কথা। আরও অনেকেই ফুটপাতে ঘুমায়। কিন্তু সেইটা শুধু রাতের বেলা। তখন ফুটপাত ফাঁকা থাকে। দিনের বেলা ফুটপাত আটকাই রাখবেন না।

জি আচ্ছা।

আর ওই সাইনবোর্ড টাইনবোর্ড যেন না দেখি আর।

কিন্তু বাবা...।

তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তার সঙ্গের গোঁফওয়ালা পুলিশটা বলল, এমনিতে আছি নানান ঝামেলায়। এর মধ্যে উটকো ঝামেলা কিন্তু ভালো লাগে না চাচা মিয়া। এইসব নাটক-ফাটক বাদ দিয়া, গাট্টি বোচকা শুদ্ধ কইরা সকালের মইধ্যে জায়গা ছাড়বেন। না হইলে কিন্তু পিটাইয়া পাছা লাল কইরা ফেলব!

আজিজ মাস্টার তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি চিন্তাও করতে পারছেন না যে এই ভাষায় তার সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারে! তিনি আবছা আলোয় হতভম্ব চোখে পুলিশটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পুলিশ অফিসার খক করে একদলা থু থু ফেলল। থুথুটা পড়ল আজিজ মাস্টারের বিছানার উপরে। ঘেন্নায় তার প্রায় বমি পেয়ে যাচ্ছিল। তিনি কোনোমতে নিজেকে সামলালেন। সেই সারারাত আর একফোঁটাও ঘুমাতে পারলেন না আজিজ মাস্টার। কেবল ব্যাগটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে একটা ঘোরের মধ্যে রাত কাটালেন।

পরদিন ভোরে অবশ্য পুলিশ দুজনকে আর দেখতে পেলেন না। তবে আসাদ এল আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই। সে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, আমার আইডিয়া কি আপনার পছন্দ হয়েছে ?

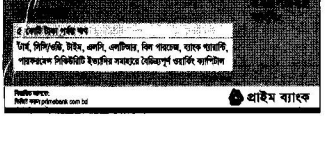

কোন আইডিয়া ?

গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়ার ঘোষণার আইডিয়া।

কী যে বলেন আসাদ সার! আমি কি সত্যি সত্যিই মরব নাকি ?

সত্যি সত্যি মরবেন না ?

আমি ভীতু মানুষ। অত সাহস আমার নাই।

তাইলে তো আরও বিপদ।

আরও কী বিপদ ?

আরও বিপদ হলো, ওইটার ঘোষণা না দিলে সত্যি সত্যিই মরবেন। আর ওইটার ঘোষণা দিলে সত্যি সত্যি মরবেন না। বরং ওইটাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

কী করকম ?

কী রকম ? শোনেন, আপনি আগেভাগে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহত্যার ঘোষণা দিবেন। কোথায়, কখন করবেন এইসবও ঘোষণায় জানিয়ে দিবেন। এতে করে দেখবেন সেই জায়গায় ঠিক ঠিক টাইমে লোকজন জমে গেছে। অত মানুষের সামনে কি আর আপনি সত্যি সত্যিই গায়ে আগুন দিয়ে পুড়ে মরতে পারবেন ? পারবেন না। সেটা সম্ভব না। কারণ তার আগেই দেখবেন সবাই আপনাকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। কিন্তু ভাগ্য যদি সহায় হয়, তাহলে দেখবেন, এই প্রতিবাদের কল্যাণে লোকজন আপনাকে কাঁধে করে মিছিল টিছিলও করে ফেলবে। আপনার একার দাবি তখন শত সহস্র মানুষের সোচ্চার দাবিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে!

শেষের দিকে এসে আসাদের গলা ভারী হয়ে এল। যেন কোনো বিশাল জনসমাবেশে সে বক্তৃতা করছে। আজিজ মাস্টার অবশ্য তার কথা শুনলেন কি না বোঝা গেল না। তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, একটা কাজ করবেন আসাদ সাব ?

কী কাজ ?

আপনি একটু বসবেন এইখানে ? আমি একটু বাথরুম টাথরুম সেরে আসতাম ?

আসাদ হাসল, আমাকে বিশ্বাস করলেন তাহলে ?

আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, না করে আর উপায় কী ?

তিনি ফিরে এসে বললেন, আমার আরেকটা উপকার করতে হবে।

কী উপকার ?

আপনি একটু বসবেন, আমি একটু ঘুমাব। সারা রাত একফোঁটাও ঘুম হয় নি আমার। শরীর খারাপ লাগছে। দেখা গেল দাবি আদায়ের আগেই মরে গেলাম।

আসাদ বলল, সেটা বরং ভালো স্যার।

ভালো কীভাবে ?

এই দেশে বেঁচে থাকলে যা নিয়ে হইচই হয় না, মরে গেলে তার চেয়ে বেশি হয়। মোটামুটি লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যায়। সত্যি সত্যি মরে গেলে দেখবেন আপনার দাবিদাওয়া নিয়ে একটা হইচই লেগে গেছে। এখানে বাঁচার চেয়ে মরাই উত্তম।

আজিজ মাস্টার অবশ্য আসাদের পুরো কথা শুনতে পেলেন না। তার আগেই তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্নও দেখে ফেললেন। দেখলেন তার বাবা দবির খাঁ বলছেন, তুই শেষ পর্যন্ত গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করলি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজ মাস্টার বললেন, আত্মহত্যা কেন বলছো বাবা ? এটা হলো প্রতিবাদ।

কীসের প্রতিবাদ ?

দাবি আদায় না হওয়ার প্রতিবাদ। ন্যায় বিচার না পাওয়ার প্রতিবাদ।

এখন কি ন্যায় বিচার পাবি ?

মনে হয় পাব।

কেন মনে হলো পাবি ?

আরে আপনি দেখেন নি ? যখন অনশন করতে বসলাম ফুটপাতে, কেউ ফিরেও তাকাল না। কোনো গুরুত্বই দিল না। বরং পুলিশ এসে পিটিয়ে উঠিয়ে দিল। পত্রিকার সাংবাদিক তো দূরের কথা একটা পথচারীও এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল না, এই বয়সের বুড়ো একটা মানুষ, কীসের দাবিতে অনশন করছে, কোন দাবি দাওয়া, কেউ কিচ্ছু জানতে পর্যন্ত চাইল না! কিন্তু গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে যেই মারা গেলাম, অমনি দেখেন আমার লাশ কাঁধে নিয়ে মিছিল পর্যন্ত হয়ে গেল।

দবির খাঁ ধমকের গলায় বললেন, আহাম্মক জানি কোথাকার! তুই আর মানুষ হলি না, অন্যের জন্য আজকাল কেউ আর নিজের জীবন দেয় ? যার যার, তার তার। তোর এত অন্যের জন্য দরদ কিসের ?

আজিজ মাস্টার বললেন, যার যার তার তার ভাবি বলেই তো আমরা এখন আর কেউ কারও না। কারও বিপদে আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াই না। অন্য কারও উপরে ঘটা কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করি না আব্বা। ভাবি, আমি নিজে তো নিরাপদ আছি। আমার ঘর, আমার সন্তান, আমার পরিবার নিরাপদ আছে। আমি কেন অন্যের বিরুদ্ধে ঘটা অন্যায়ের প্রতিবাদে যাব ? কিন্তু বাবা এতে করে অন্যায়কারী আরও সাহস পায়। একসময় সে আমার ঘরে, আমার পরিবারেও ঢুকে পড়ে। তখন আমার মতোই অন্যরাও চুপ করে থাকে। আমার জন্য প্রতিবাদ করতেও আর কেউ আসে না।

দবির খাঁ হাসলেন, তুই তো দেখি ছাত্র পড়াতে পড়াতে বাপের কাছেও মাস্টারি শুরু করছিস। খুব খারাপ অভ্যাস। খুব খারাপ।

আজিজ মাস্টার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই তার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি পিটপিট করে চোখ মেলে তাকালেন। বিশাল রেইনট্রি গাছটার মাথার উপরে উঠে গেছে সূর্য। তার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে আসাদও। তিনি আসাদকে ডাকতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তার পিঠের কাছটায় তীব্র একটা ব্যথা। দীর্ঘ সময়ের গভীর ঘুমের কারণে তিনি এতক্ষণ বুঝতে পারেন নি। তার সামনে কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। রাতের সেই পুলিশ অফিসার সাগরও তাদের মধ্যে আছে। তার হাতে লাঠি। প্রথমবারের আঘাতটা ঘুমের কারণে তেমন টের না পেলেও দ্বিতীয়বারের আঘাতটা টের পেলেন আজিজ মাস্টার। সাগর তার কাঁধ বরাবর আঘাতটা করল।

আজিজ মাস্টারের মনে হলো, তার কাঁধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। একজন বৃদ্ধ স্কুলশিক্ষককে এভাবে কেউ কখনো আঘাত করতে পারে, তা তিনি ভাবেন নি। রাজ্যের বিস্ময়, হতাশা, অপমান নিয়ে তিনি অসহায়ের মতন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইলেন। পুলিশ অফিসার এবার গাল বকল, অনশন মারাও, না ? অনশন ? এরপর কী ? মিছিল ? মিটিং ? হরতাল ? ঘটনা কী, খুইলা ক ? আসল উদ্দেশ্য কী ? খবর আছে আমাদের কাছে, বিরোধীদল এই এলাকায় নাশকতার চেষ্টা করবে, তোর উদ্দেশ্য কী ক ?

আজিজ মাস্টার পুলিশের কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি একইভাবে তাকিয়ে আছেন। অন্য পুলিশ সদস্যটি জোরে লাথি বসাল আসাদের কোমরে। আসাদ ধড়ফড় করে উঠে বসল। সে কিছু বলার আগেই পুলিশটি বলল, কাইল দেখলাম একজন, আজই দুইজন ? ঘটনা কী ? ঘটনা বল ? উদ্দেশ্য কী তোদের ? কোন দল করস ? নাকি আবার জঙ্গি ফঙ্গি ? এইসব ভং ধইরা শেষে আসল ঘটনা ঘটাইবি ?

ঘটনা বেশিদূর গড়ানোর আগেই আসাদ সামলে নিল। পুলিশের হাতে পায়ে ধরে, চা নাস্তার জন্য পকেটে কিছু গুঁজে দিয়ে কোনোমতে আজিজ মাস্টারকে নিয়ে ভাগল। আজিজ মাস্টার বিষয়টা নিতে পারলেন না। এই অপমান তিনি তার বাকি জীবনে আর কখনো ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। মানসিকভাবে বড় ধরনের আঘাত পেয়েছেন তিনি।

আসাদ থাকে খুপরিমতন এক ঘরে। সেখানেই এনে আজিজ মাস্টারকে ওঠাল সে। কিন্তু রাত থেকেই শুরু হলো ভয়াবহ জ্বর। সেই জ্বরে কিংবা দুপুরের ঘটনার প্রভাবে, যে কারণেই হোক, এলোমেলো প্রলাপ বকতে থাকলেন আজিজ মাস্টার। ঘুমের মধ্যেই ছটফট করতে থাকলেন সারা রাত। আসাদও ঘুমাতে পারল না। রাত জেগে সেবা শুশ্রূষা করল সে। শেষরাতের কাছে কোথাও ফজরের আজানের শব্দ শোনা গেল। খানিক তন্দ্রার মতো লেগে এসেছিল আসাদের। আজানের শব্দে আচমকা তন্দ্রা ভেঙে জেগে উঠল সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুমের ঘোরে বলা আজিজ মাস্টারের এলোমেলো কথাগুলো কানে এল তার। যদিও সেই কথাগুলোর বেশির ভাগই সে একটা থেকে আরেকটা আলাদা করতে পারল না। তবে বারবার বলা একটা নাম মাথায় গেঁথে গেল আসাদের।

কোহিনুর!

আজিজ মাস্টার একনাগাড়ে কোহিনুর কোহিনুর বলে চিৎকার করছিলেন। আর থেকে থেকে কাঁদছিলেন। সেই রাতেই ভোরের আলো ফোটার আগে আগে আসাদ হঠাৎ আবিষ্কার করল, আজিজ মাস্টার আসলে ঢাকায় তার স্কুলের দাবি নিয়ে আসেন নি। তিনি এসেছেন অন্য দাবি নিয়ে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেই দাবির কথা বলতে তিনি ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু বিষয়টা ক্রমাগত তাকে আহত করে চলেছে। তীব্র যন্ত্রণা দিচ্ছে। বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে না পেরে ভেতরে ভেতরে শেষ হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

আজিজ মাস্টারের জ্বর সারতে লাগল দিন তিনেক। তবে পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও সময় লাগল। এক বিকেলে তাকে নিয়ে খোলা হাওয়ায় হাঁটতে বের হলো আসাদ। সে চেষ্টা করছে আজিজ মাস্টারের সঙ্গে কথা বলে তার ভেতরকার ঘটনা জানার। কিন্তু আজিজ মাস্টার কথা বলছেন খুব কম। সেদিনের ঘটনার পর থেকে ভেতরে ভেতরে অনেকটাই গুটিয়ে গেছেন তিনি। এক প্রশ্ন দুবার তিনবার করলেও উত্তর দেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।

আসাদ নানাভাবে চেষ্টা করছে তাকে স্বাভাবিক করতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। শেষে সরাসরি কোহিনুরের প্রসঙ্গটাই তুলল সে, কোহিনুর কে স্যার ?

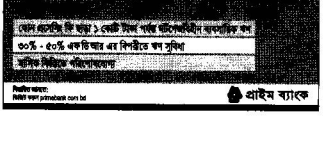

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজ মাস্টার হঠাৎ চমকে গেলেন। তিনি ঝট করে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। তারপর তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে। তবে কোনো কথা বললেন না। আসাদ প্রশ্নটা আবারও করল, কোহিনুর কে স্যার ? কী হয়েছিল তার ?

আজিজ মাস্টার যেন নিজেকে সামলে নিলেন খানিকটা। তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন, কোন কোহিনুর ?

যেই কোহিনুরের জন্য আপনি ঢাকায় এসেছেন।

আমি কোহিনুরের জন্য ঢাকায় আসব কেন ?

সেটা আপনিই ভালো জানেন স্যার।

নাহ, আমি কিছু জানি না। আমি ঢাকায় আসছি আমার স্কুলের জন্য।

আসাদ হাসল, আমার কাছে কিছু লুকিয়ে লাভ নেই স্যার। এই তিনদিন আপনি জ্বরের ঘোরে ঘুমের মধ্যে অনেক এলোমেলো কথা বলেছেন। তা ছাড়া আপনার ব্যাগের ভেতর একটা ব্যানারও আছে।

ব্যানার ?

হুঁ। হলুদ একটা ব্যানার। সেটার উপর কালো কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা। আপনি মূলত ওই ব্যানারটা টানিয়ে, ওই ব্যানারের দাবি আদায়ের জন্যই অনশন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে সেটি করতে পারেন নি।

আজিজ মাস্টার বুঝলেন তিনি ধরা পড়ে গেছেন। এখন আর বিষয়টি লুকানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। তারপরও তিনি চেষ্টা করলেন লুকানোর। নানান ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাতে অবশ্য লাভ হলো না। কিছুতেই সন্তুষ্ট হলো না আসাদ। বরং আজিজ মাস্টারের কাঁধে হাত রেখে সে নরম গলায় বলল, আপনি আমাকে ঘটনা খুলে বলেন স্যার। আমি মানুষ চিনতে ভুল করি নি। আপনি খাঁটি মানুষ। ভেতরে ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা আপনি বয়ে বেড়াচ্ছেন। এই যন্ত্রণা থেকে আপনার মুক্তি দরকার।

আজিজ মাস্টারের হঠাৎ কী হলো! তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আসাদ অবশ্য তাকে বাধা দিল না। সামলাতে সময় দিল। দীর্ঘসময় পর আজিজ মাস্টার বললেন, ওই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তো আমি এইভাবে ঢাকা শহরে আসছিলাম আসাদ সাব। গত কয়টা মাস আমি ঘুমাইতে পারি না, খাইতে পারি না। সারাক্ষণ মাথার ভেতর চিনচিনে করে ব্যথা হয়। অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তো আমার জানা নাই।

কী হয়েছে আমাকে খুলে বলেন।

আজিজ মাস্টার সঙ্গে সঙ্গেই কথা বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ধীরে সুস্থে বললেন, বাসায় ফিরে রাতে বলি ?

আসাদ আজিজ মাস্টারের হাত ধরে দাঁড়া করাল। তারপর নরম গলায় বলল, আচ্ছা।

চিলেকোঠার ঘরটার বাইরে খোলা ছাদ। সেখানে ফুরফুরে হাওয়া বইছে। পাশাপাশি দুখানা চেয়ার পাতা। আকাশে অজস্র নক্ষত্র। সেই নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে বসে আজিজ মাস্টার কথা শুরু করলেন, আমার আব্বা মারা গেছেন প্রায় তিরিশ বছর। আব্বার খুব শখ ছিল একটা স্কুল হবে ওই এলাকায়। সে কাজও কিছু শুরু করেছিলেন, কিন্তু গুছিয়ে আনতে পারেন নি। তার আগেই মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অনেক কষ্টে আমি স্কুলটা শুরু করি। আব্বার নামেই নাম দেই, দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাই স্কুল। আব্বার রেখে যাওয়া যত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তার সবই মনে করেন এই তিরিশ বছরে স্কুলের পেছনে খরচ করছি। কিন্তু স্কুল এমপিওভুক্ত করতে পারি নাই।

কেন ? এত বছরে তো হয়ে যাওয়ার কথা!

কারণ নুরুল মোল্লা।

নুরুল মোল্লা কে ?

দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের সভাপতি। স্থানীয় চেয়ারম্যানও সে। রাজনীতিতে ভালো নামডাক। ভবিষ্যতে এমপি হওয়ার সম্ভাবনাও তার আছে।

স্কুল এমপিওভুক্ত হলে তার সমস্যা কী ?

আজিজ মাস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সমস্যা তেমন কিছু না। আবার কিছুও।

তার মানে কী ?

মানে হলো, উনি চান স্কুলের নামকরণটা ওনার নামে হোক। ওনার নামে হলেই উনি বাদবাকি সব ব্যবস্থা করে দিবেন।

কিন্তু আপনি রাজি হন নি। তাই তো ?

হুম। এত কষ্ট করে এত বছর, বিজের সব সহায়-সম্পত্তি শেষ করে স্কুলটা করলাম। আর এখন সেইটার নাম হবে অন্য একজনের নামে! বিষয়টা মেনে নিতে পারি নাই আমি।

পারার কথাও না।

এই নিয়েই সমস্যা। তো আমাকে রাজি করাতে না পেরে শুরু হলো তার ষড়যন্ত্র। সরাসরি কিছু না বললেও পেছন থেকে প্রায় সব উপায়েই সে চেষ্টা করতে থাকল যাতে কোনোভাবেই স্কুলটা সরকারি না হয়। আমিও অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। কারণ কোনো বড় নেতা, বা কোনো মন্ত্রী-মিনিস্টারের সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।

আজিজ মাস্টার একটু থামলেন। আসাদ বলল, তারপর ?

তারপর আর কী। একটা সময় এসে আমি তার প্রস্তাব মেনে নিলাম।

মেনে নিলেন!

হুম। অসহায় গলায় বললেন আজিজ মাস্টার।

তাহলে আর কী ? সমস্যা তো মিটেই গেল।

উঁহু। মিটল না। আমি আসলে তখনো তাকে কিছু বলি নি। তবে মনে মনে নিজেকে বোঝালাম যে শুধু নামের কারণে স্কুলটা বন্ধ হয়ে যাবে ? আমি আর চালাতে পারছিলাম না একা একা। তো স্কুলটা বন্ধ হয়ে গেলে ওই এলাকার হাজার হাজার ছেলেমেয়ের পড়াশোনার সুযোগটা নষ্ট হয়ে যাবে। তারচেয়ে তার প্রস্তাবটা মেনে নেই। নামে আর কী এসে যায়! নামের চেয়ে এই ছেলেমেয়েগুলোর ভবিষ্যৎ অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তো প্রস্তাব শুনে উনি কী বললেন ?

উনাকে প্রস্তাবটা দেওয়ার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। তখনো আমি পুরোপুরি সিদ্ধান্তটা নিতে পারি নি। নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করছিলাম। কিন্তু ওই ঘটনাটা সব ওলটপালট করে দিল।

কী ঘটনা?

স্কুলে ক্লাস টেনের এক ছাত্রী, নাম কোহিনুর। সে একদিন লাইব্রেরিতে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

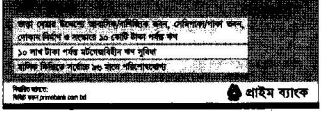

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন ?

নুরুল মোল্লার একটাই ছেলে। রাকিব। স্কুলের গেটে, রাস্তায় দলবল নিয়ে সে মেয়েদের উত্যক্ত করত। যা হয় আর কী, বাপের অনেক ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আর পরিবার থেকেও কোনো শাসন বারণ ছিল না। ফলে দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছিল সে। নুরুল মোল্লার ভয়ে কেউ কিছু বলতেও সাহস পেত না। স্কুলে আসার পথে সে প্রায়ই কোহিনুরকে বিরক্ত করত। বিষয়টা দিন দিন বাড়ছিল।

আচ্ছা।

কোহিনুরকে ওভাবে কাঁদতে দেখে আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু করারও তেমন কিছু ছিল না। ওই এক স্কুলের জন্য খাটতে খাটতেই মনে হয় সাহস শক্তি যা ছিল সব হারিয়ে ফেলছি। বড় গলায় যে কাউকে কিছু বলব, সেই অবস্থাও আর নেই। তারপরও নুরুল মোল্লার কাছে গেলাম। গিয়ে ঘটনা বললাম। ভেবেছিলাম বিষয়টা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হবেন। কিন্তু আমাকে চমকে দিয়ে তিনি বললেন, এই বয়সে পোলাপান এমন একটু আধটু করেই। এইটা নিয়া এত সিরিয়াস হওয়ার কিছু নাই। কী মাস্টার সাব, বয়সকালে আপনে এমন কিছু করেন নাই ?

শুনে আপনি কী বললেন ?

আমার হঠাৎ রাগ লেগে গেল। কিন্তু তারপরও কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, চেয়ারম্যান সাব, মেয়ে কিন্তু আমাদের সবার ঘরেই আছে। আপনার ঘরেও আছে, আমার ঘরেও আছে। এখন আমরা যদি এগুলোরে গুরুত্ব না দেই, তাহলে আমাদের মেয়েদের বেলায় কি অন্যরা গুরুত্ব দিবে ?

শুনে কী বলল সে ?

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন। কারণ তার ঘরেও দুজন বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। তাদের একজন তখন কেবল বাইরে থেকে ঘরে ফিরছিল। তো চেয়ারম্যান সাব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বললেন, এইটা একটা জ্ঞানী মানুষের মতো কথা বলেছেন মাস্টার সাব। ঘর শাসন না করলে আমি পর শাসন করব কেমনে! মেয়ে তো আমার ঘরেও আছে। আপনার ঘরেও আছে। মেয়ের বাপ হিসেবে নিজের ছেলেদের আগে শাসন করাটা জরুরি। আজই আমি ছেলেকে ডেকে শাসিয়ে দিব। তার কথা শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।

তারপর ? কাজ হয়েছিল ?

আজিজ মাস্টার ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, উঁহু। ছেলেকে তিনি কী বলেছিলেন জানি না। কিন্তু এরপর থেকে সে আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠল। পরদিন বিকেলেই কোহিনুরের গায়ের ওড়না টেনে ছিঁড়ে ফেলল সে।

কী বলছেন স্যার ?

হুম।

শুধু তাই-ই না। আজিজ মাস্টারের গলা যেন ভারী হয়ে উঠল, রাস্তার মাঝখানে তাকে জাপটে ধরে চুমুও খেল সে।

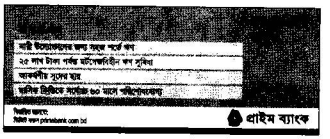

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর সেই দৃশ্য আবার মোবাইল ফোনে ভিডিও-ও করে রাখল তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

কেউ ছিল না সেখানে ? কেউ কিছু বলল না ?

উঁহু। নুরুল মোল্লা ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতি করেন। কে কী বলবে ?

তাই বলে প্রকাশ্য রাস্তায় ?

আজিজ মাস্টার করুণ ভঙ্গিতে হাসলেন, এই ঘটনা তো আর এই দেশে নতুন কিছু না। অহরহ হয়, হচ্ছে। হয় না ?

আসাদ জবাব দিল না। আজিজ মাস্টার বললেন, এরপর থেকে কোহিনুরের জীবনটা সত্যিকার অর্থেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। রাকিবের সাঙ্গপাঙ্গরা সেই ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া শুরু করল। সাথে নানান কুপ্রস্তাব তো রয়েছেই। এক সন্ধ্যায় কোহিনুর তার মাকে নিয়ে আমার বাড়িতে এল। তারপর হঠাৎ আমার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

মাস্টারের গলাটা ভারী হয়ে এল। তিনি খানিক থামলেও আসাদ কোনো কথা বলল না। আজিজ মাস্টার বললেন, কোহিনুরের কাছে সব শুনে আমি চুপ করে রইলাম। কিছু বলতে পারলাম না তাকে। কী বলব ? আমার তো কিছু করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। নিজেকে খুব অথর্ব আর মেরুদণ্ডহীন মনে হতে লাগল। পরদিন খুব ভোরে ফজরের নামাজ পড়েই মোল্লাবাড়ি গেলাম। গিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবকে সব খুলে বললাম। শুনে তিনি আর আগের মতো হেসে উড়িয়ে দিলেন না। যারপরনাই চিন্তিত হলেন। রেগেও গেলেন। তারপর বললেন, এরকম হইলে তো ঝামেলা মাস্টার। আমি কিছু বললাম না। চেয়ারম্যান সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আগের ঘটনা পর্যন্ত তাও মেনে নেওয়া যেত। এই বয়সের পোলাপান, একটু এদিক সেদিক করেই। কিন্তু তাই বলে এমন জঘন্য ঘটনা ? আমি এই এলাকার চারবারের চেয়ারম্যান। আর আমার এলাকায় মেয়েছেলেরা রাস্তাঘাটে এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়বো! আমার জন্য এর চেয়ে আর লজ্জার কী হইতে পারে! আমার একটা মানসম্মান আছে। মোল্লাবাড়িরও আছে। সেই বাড়ির সন্তান হয়ে আমার ছেলে...! চেয়ারম্যান সাহেব নিজেই আপসেট হয়ে গেলেন। ভেঙে পড়লেন একভাবে। বিষয়টা দেখে আমার একভাবে ভালোও লাগল যে এবার নিশ্চয়ই তিনি কিছু একটা করবেন। আমি আর কিছু বললাম না। তাকে ওইরকম ভেঙে পড়তে দেখে আমি নিজেই বরং তারে সান্ত্বনা দেওয়া শুরু করলাম।

তারপর ? কী করল সে ?

বলল, এইবার এর একটা বিহিত তিনি করবেনই। তার ছেলে কেন, গ্রামে কেউ আর কোনোদিন এইরকম কিছু করবে না।

বাহ! তাহলে তো লোক ভালো সে।

হুম। ভালো লোক। এর এক সপ্তাহর মাথায় আত্মহত্যা করল কোহিনুর।

কী! রীতিমতো ধাক্কা খেল আসাদ, কী বলছেন স্যার ? কী হয়েছিল ?

আজিজ মাস্টার শান্ত গলায় বললেন, যেদিন রাতে সে আত্মহত্যা করে, সেদিন সন্ধ্যার পরপর সে আমার বাড়ি এসেছিল।

কেন ?

তখনো আমি জানতাম না কেন। কারণ, আমি সেদিন বাড়িতে ছিলাম না। স্কুলের বিষয়ে জরুরি এক কাজে থানা শহরে ছিলাম সেদিন। সন্ধ্যার দিকে আমার মেজো মেয়ে রুমুর কাছে একটা বই দিয়ে গিয়েছিল কোহিনুর। বলেছিল, আমি ফিরলে যেন বইটা আমারে দেয়।

কী ছিল সেই বইতে ?

সেটা তো পরদিন আর জানা যায় নাই। কারণ পরদিন ভোরেই কোহিনুরের লাশ পাওয়া যায় তার ঘরে। সিলিং ফ্যানের সাথে ঝোলানো। পুরো গ্রামে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল। তার লাশ, থানা, পুলিশ এই সব নিয়েই সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই বইয়ের কথা আর মনে রইল না কারও। খবর শোনার পর থেকে আমার অবস্থা তখন পাগলপ্রায়। জানি না কেন, আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ খচখচ করতে লাগল। আমি তার পরদিন থেকে চেষ্টা করলাম কোহিনুরের বাপ-মায়ের সাথে কথা বলতে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো তারা কেউই আমার সাথে কথা বলতে চাইল না। কথা তো দূরের কথা, দেখাই করতে চাইল না আমার সাথে। যেন কোহিনুরের এই আত্মহত্যার পেছনে আমিই দায়ী।

কেন ? আপনার সাথে দেখা করতে চাইল না কেন?

জানি না কেন! তবে পরদিন আমি বিষয়টা নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই চেয়ারম্যান সাহেব একদম কেঁদে দিলেন। হাউমাউ করে কান্না। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, এই বয়সের একটা মেয়ে, কী এমন দুঃখে এইভাবে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল মাস্টার সাব ? আপনারা স্কুলে বাচ্চাকাচ্চাদের পড়ান। এত এত হোমওয়ার্ক দেন। পরীক্ষা নেন। কে কত নম্বর পায় পরীক্ষায়, সেইটা দেখেন। কিন্তু তাদের কার মনে কী চলতেছে, সেইটা দেখেন না। এমন হইলে হবে বলেন ? খালি ক্লাসের বই পড়ালেই হবে না। সাথে তাদের মানসিক অবস্থাটাও দেখতে হবে। কে কী ভাবছে, কে কী করছে, এইগুলা খেয়াল না রাখলে হবে ? হবে না। তা ছাড়া শিক্ষক তো শুধু শিক্ষকই না, সে ছাত্র-ছাত্রীর গার্ডিয়ানও। গার্ডিয়ান না ?

আপনি কী বললেন ?

আমি রাকিবের প্রসঙ্গটা তুলতে যাচ্ছিলাম। এবং সেই প্রথম আমি নুরুল মোল্লার আসল চেহারাটা দেখলাম। তিনি প্রায় সরাসরিই হুমকিটা দিলেন আমাকে। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, রাকিবের বিষয়ে আর কোনো কথা তিনি শুনতে চান না। কোনো উচ্চবাচ্যও না। এমনিতেই নাকি পুলিশ বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ করছে। নানাভাবে খোঁজখবরও নেওয়ার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে রাকিবের বিষয়টা পুলিশের কানে গেলে বিপদ। তিনি চান না, এ বিষয়ে পুলিশ কিছু জানুক।

আপনি কী করলেন তারপর ?

আমি আর কী করব ? অসহায় ভঙ্গিতে বললেন আজিজ মাস্টার, আমি তো ওই একটাই পারি। উল্টাপাল্টা কিছু ঘটলেই রাতের পর রাত ঘুম হয় না আমার। কিছু খেতে পারি না। গলার কাছটায় কী যেন দলা পাকিয়ে থাকে। এবারও তেমন হওয়া শুরু করল। চোখ বন্ধ করলেই কোহিনুরের কান্নাজড়িত অসহায় মুখটা চোখের সামনে ভাসে। আর মনে হয়, ওইটুক একটা মেয়ে কোন সাহসে এইভাবে নিজেরে নিজে খুন করে ফেলল ? আমি তো পারি না। অত সাহস তো আমার নাই।

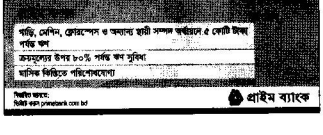

ওটা সাহস না, দুঃসাহস। মানুষ দুই কারণে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। ভয়ে আর শক্তিতে। সে ভয়ে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল।

হুম। আমি এটাও ভাবছি। কতটুক ভয় পেলে অতটুক একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চা মেয়ে নিজের জীবনটা এইভাবে শেষ করতে পারে ? এই এত বছরের জীবনেও তো আমি কোন সাহসে বা ভয়ে আত্মহত্যার সাহস করতে পারি নাই। এই বয়সে এখনো বাঁচতে ইচ্ছে করে। মৃত্যুকে ভয় লাগে। অথচ ওইটুকু একটা মেয়ে! পরদিন ভোরে উঠে আমি স্থানীয় থানায় গেলাম। থানার ওসি সব শুনে হাসলেন। বললেন, মাস্টার সাব, আপনি মান্যগণ্য লোক। এমন কিছু করবেন না, যাতে মানসম্মান না থাকে।

মানে ? আসাদ একটু অবাকই হলো।

আজিজ মাস্টার অসহায় ভঙ্গিতে হাসলেন, ওসি সাহেব বললেন, নুরুল মোল্লা সাবও মান্যগণ্য লোক। আপনিও গণ্যমান্য লোক। এখন তার ছেলের বিরুদ্ধে যদি আপনি এমন অভিযোগ করেন, তাইলে বিষয়টা ভালো দেখায় না। কারণ বিষয়টা চেয়ারম্যান সাবের মানসম্মানের সাথে জড়িত। তাই না ? আপনারা যারা সমাজে মান্যগণ্য লোক আছেন, তাদের একজনের উচিত আরেকজনের মানসম্মান রক্ষা করা। আর আপনারাই যদি একজন আরেকজনের পিছনে লাগেন, তখন আমরা কী করব বলেন ?

আচ্ছা ? আপনি কী করলেন ?

আমি তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু লাভ হলো না। বরং শেষের দিকে যেন খানিক উগ্রই হয়ে উঠলেন ওসি সাহেব। আমাকে একভাবে ধমকের গলায়ই বললেন, আজ যান তো স্যার। বহুত কাজ জমে আছে হাতে। আপনাদের মতো ক্লাসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আরামের জীবন পার করলে তো আমাদের চলে না। আমাদের দিন রাত জেগে চোর ডাকাত ধরে আপনাদের আরামের ঘুমের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। আমি তারপরও বললাম, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন ওসি সাব। আপনি চাইলে আমি দুয়েকজন সাক্ষীপ্রমাণও হাজির করতে পারব। নুরুল মোল্লার ছেলেটার কারণে মেয়েটার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। এই কারণেই সে আত্মহত্যা করছে। এবার ক্ষেপে গেলেন ওসি সাহেব। তিনি ঠান্ডা গলায় বললেন, সাক্ষী জোগাড় করা তেমন কঠিন কোনো কাজ না। দুই চারটা পয়সা ছিটালেই সাক্ষীর অভাব হয় না। কঠিন হলো অকাট্য তথ্য প্রমাণ জোগাড় করা। আছে আপনার কাছে কোনো তথ্য প্রমাণ ? আজকাল অডি ভিডিওর যুগ। ছবির যুগ। আছে এগুলা কিছু ? থাকলে নিয়া আসেন। আমি দেখব। এখন যান। বিরক্ত কইরেন না প্লিজ।

আজিজ মাস্টার একটু থেমে আবার বললেন, আমি তারপরও কিছু বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ দিলেন না। একপ্রকার থানা থেকে বেরই করে দিলেন আমাকে। প্রচণ্ড মন খারাপ হলো। ভেঙেও পড়লাম। কিন্তু হাল ছাড়লাম না। অনেক ভেবেচিন্তে গেলাম থানা শহরের স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে। যদি তাদের মাধ্যমে কিছু হয়! কিন্তু হলো না। বরং তাদের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। তারা কোনো সহযোগিতা তো করলেনই না। উপরন্তু দুয়েকজন সাংবাদিক উল্টো আমার দিকেই আঙুল তুলল। বলল, স্কুলের নামকরণ নিয়ে নুরুল মোল্লার সাথে দ্বন্দ্বের জের ধরেই নাকি আমি কোহিনুরের ঘটনায় তাকে জড়াতে চাইছি! বিশ্বাস করবেন কী না জানি না, আমার মনটাই ভেঙে গেল। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে সেই রাতে বাড়ি ফিরলাম আমি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এত অসহায় লাগছিল। অন্তত সাংবাদিকদের কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করি নাই আমি।

হাত বাড়িয়ে আজিজ মাস্টারের একটা হাত চেপে ধরল আসাদ। আজিজ মাস্টার কাঁপছেন। তার চোখে অশ্রু কি না অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না।

আজিজ মাস্টার ভেজা গলায় বললেন, তবে ঘটনা পরিষ্কার হলো তার পরদিন। স্কুলের দপ্তরি জয়নালের কাছে জানলাম, কোহিনুরের ঘটনার দিন কয়েক পরেই নাকি নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের দাওয়াত দিয়ে ভুড়িভোজ করিয়েছেন নুরুল মোল্লা। সাথে হাতখরচ তো ছিলই। কোহিনুরের ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন। আবেগঘন বিবৃতি দিয়েছেন। গভীর শোক, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মানসিক সাপোর্টও যে শিক্ষকদের দিতে হবে, এই বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনাও করেছেন। পরদিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সেসব ফলাও করে ছাপাও হয়েছিল।

বাহ! অস্ফুটে আপনাআপনিই যেন মুখ থেকে শব্দটা বের হয়ে গেল আসাদের।

পুরোপুরি হতাশ হয়ে গেলাম আমি। মনে হলো পৃথিবীতে আমার মতো অথর্ব, অসহায়, প্রয়োজনহীন মানুষ বুঝি আর নেই। এলাকায় তরুণদের একটা সমাজকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে। সেই সংগঠন বিভিন্ন সময়ে এলাকার নানা অনিয়ম, অপরাধের প্রতিবাদ করে। ফিলিস্তিনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের হামলার প্রতিবাদে মিছিল, মিটিং, মানববন্ধনও করেছে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমার সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিল তারা। এগুলোও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কোনো উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেও গেলাম। মনে হয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই এমন একটা ঘটনায় রুখে দাঁড়াবে। প্রতিবাদ করবে।

তারপর ? কী করল তারা ?

কিছুই করল না।

মানে ?

মানে এরা সরাসরি জানিয়ে দিল এই বিষয়ে যেন আর কোনো কথা না বলি আমি!

কেন ?

কারণ এই ক্লাবটিও রাজনৈতিক। আজকাল বোধহয় লাভ লোকসানের হিসেব ছাড়া কেউ কিছু করে না। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ও ঠিক হয় লাভ লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। ওই ক্লাবটাকে অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন বলা হলেও আসলে ভেতরের ঘটনা অন্য। নুরুল মোল্লা নিজে এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রতিবছর ঈদ-কুরবানিসহ নানান অনুষ্ঠান আয়োজনে এই ক্লাবে মোটা অঙ্কের ডোনেশন দেয় সে। ফলে এলাকার ছেলেপেলেরা নুরুল মোল্লার বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলবে না। তা যা-ই ঘটুক না কেন! উপরন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে বা করলে তা তারা সবাই মিলে ঠেকাবে!

আজিজ মাস্টার থামলেন। আসাদও চুপ। কেবল অন্ধকারে দূর থেকে ভেসে আসছে গাড়ির হর্নের শব্দ। রিকশার টুং টাং ধ্বনি। অনেকক্ষণ পর আসাদ বলল, তারপর কী করলেন আপনি ?

পুরোপুরি ভেঙে পড়লাম। বুঝতে পারছিলাম কিছুই করতে পারব না। কিন্তু তারপরও নানান দুশ্চিন্তায় সারা রাত জেগে থাকি। খানিক ঘুমালেও পরক্ষণেই দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। কতভাবে যে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। অস্থির লাগে সারাক্ষণ। নিজেকেই নিজের অসহ্য লাগতে থাকে। এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

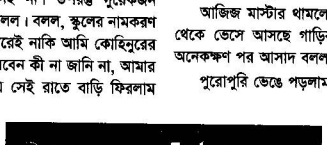

সময় এমনই একদিন আমার মেজো মেয়ে রুমু হঠাৎ কোহিনুরের দেওয়া সেই বাংলা বইখানা আমাকে দিয়ে গেল। এতদিন বইখানার কথা সে ভুলেই ছিল। মেয়েকে আমি গালমন্দও কম করলাম না। রাগও হলো ওর উপর খুব। কিন্তু আমার সকল রাগ, হতাশা, ক্রোধ, ক্ষোভ সকলই উড়ে গেল বইটা খোলার পর।। মনে হলো আমার কোনো অনুভূতি নেই। শরীরে যেন সাড় নেই। মৃত একটা লাশ যেন আমি। অথচ সবকিছুই দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। কিন্তু কিছু করতে পারছি না।

কী ছিল সেই বইয়ের ভেতর ? শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আসাদ।

একটা চিঠি।

চিঠি ?

হুম। কোহিনুরের নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি। মাত্র তিন লাইনের চিটিঠা লিখেছিল সে। তারপর আত্মহত্যা করার আগে দিয়ে গিয়েছিল।

কী লেখা ছিল চিঠিতে ?

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন না আজিজ মাস্টার। দীর্ঘসময় চুপ করে রইলেন। তারপর অকস্মাৎ মুখ তুলে তাকালেন আকাশের দিকে। তারপর চোখ বন্ধ করে স্থির, নিস্তব্ধ বসে রইলেন। যেন বয়ে যাচ্ছে অনন্ত সময়। তারপর বললেন, তাকে ধর্ষণ করেছে নুরুল মোল্লা!

কী! আসাদ যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

হুম। শান্ত গলায় বললেন আজিজ মাস্টার। খানিক থেমে তারপর আবার বললেন, সে লিখেছে—স্যার, আপনে আমারে কার কাছে বিচারের জন্য পাঠাইলেন স্যার ? সে তো মানুষ না, সে তো তার ছেলের চাইতেও খারাপ। আস্ত জানোয়ার। সে একটা বুড়া শয়তান, একটা পশু। এই রকম অমানুষের পৃথিবীতে এই নোংরা জীবন নিয়া আমি আর বাঁচতে চাই না স্যার...।

আজিজ মাস্টার থামলেন। আসাদ কোনো কথা বলল না। আজিজ মাস্টারই আবার বললেন, চিঠিখানা হাতে পেয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম। কতক্ষণ বসে ছিলাম আমি জানি না। তবে পুরো ঘটনার জন্য আমার তখন নিজেকেই অপরাধী লাগতে লাগল। মনে হলো কোহিনুরকে আমি খুন করেছি। কারণ, নুরুল মোল্লার কাছে আমিই তাকে যেতে বলেছিলাম।

কেন ?

কারণ, রাকিবের বিরুদ্ধে নুরুল মোল্লার কাছে বিচার দেওয়ার পর তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন কোহিনুরের কাছ থেকে সরাসরি সব ঘটনা শুনতে চান। এমনকি রাকিবকে কোহিনুরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে মাফ চাওয়ানোর কথাও বলেছিলেন তিনি। আমাকে এটাও নিশ্চিত করেছিলেন যে বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথেই দেখবেন তিনি। কারণ এর সাথে তার মানসম্মান জড়িত। তার কথা শুনে আমারও কেন যেন বিশ্বাস হয়েছিল। আমি তাই কোহিনুরের মাকে বলেছিলাম, কোহিনুরকে তার কাছে নিয়ে যেতে। কিন্তু এরপর কী হয়েছিল সেই খবর আর নেওয়া হয় নি আমার। স্কুলের একটা কাজ নিয়ে কয়েকটা দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম তখন।

কিন্তু চিঠিতে তো ধর্ষণের ঘটনা কিছু স্পষ্ট লেখা ছিল না।

তা ছিল না। এমনকি ওরকম জঘন্য, নোংরা কথা চিন্তা করতে আমার মনও সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু কোহিনুরের চিঠিতে ঘটনা স্পষ্ট। নুরুল মোল্লার সাথে দেখা হওয়ার পর এমন জঘন্য কিছুই ঘটেছিল, যার কারণেই সে আত্মহত্যা করেছিল।

কিন্তু ওই চিঠি দিয়ে কি আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন ?

নাহ, পারব না। যেখানে থানা পুলিশই তার পক্ষে, সেখানে ওর চেয়ে শক্ত প্রমাণ থাকলেও কিছু প্রমাণ করা যেত না...।

একটা কথা। আসাদ মাঝপথে থামাল আজিজ মাস্টারকে।

লাশের ময়নাতদন্ত করা হয় নি ? সেখানে ধর্ষণের কোনো আলামত ?

কিছুই হয় নি। প্রথমে একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল পরিস্থিতি। কিন্তু তারপর পুলিশ স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবেই লাশ দাফন করেছে।

ওহ। যেন দমে গেল আসাদ, তারপর কী হলো ?

চিঠিটা পড়ার পর থেকে আমার মাথা খারাপের মতো অবস্থা হয়ে গেল। পরের কয়েকটা দিন পাগলের মতো ছুটলাম। জানতাম, শুধু এই চিঠি দিয়ে নুরুল মোল্লার বিরুদ্ধে শক্ত কোনো তথ্য প্রমাণ হাজির করতে পারব না। চিঠিতে কারও নাম নেই, পরিচয় নেই, ঘটনার বিবরণ নেই। আর স্থানীয় প্রশাসন তো এমনিতেই নুরুল মোল্লার পক্ষে। তারপরও অনেক কষ্টে কোহিনুরের বাবা মার সাথে দেখা করলাম। তাদের সাথে কথা বললাম। বোঝালাম। কিন্তু তাদের চোখে মুখে স্পষ্ট আতঙ্ক। কারণ, আরও দুটো মেয়ে রয়েছে তাদের। ফলে ভয়ে কোনোভাবেই মুখ খুলতে চাইছিলেন না তারা।

তারা তো ঘটনা জানত ?

হুম। অনেক কষ্টে কোহিনুরের মাকে কিছুটা হলেও বোঝাতে পারলাম। দিন কয়েকের টানা চেষ্টায় অবশেষে তিনি আমার কাছে মুখ খুললেন। ভয়ে ভয়ে ঘটনা খুলে বললেন।

কী ঘটনা ?

আমি যেদিন তাকে নুরুল মোল্লার কাছে কোহিনুরকে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, সেদিনই তিনি কোহিনুর আর কোহিনুরের বাবাকে নিয়ে নুরুল মোল্লার কাছে গিয়েছিলেন। নুরুল মোল্লা সেদিন তাদের সাথে অসম্ভব ভালো ব্যবহারও করেছিলেন। এমনকি কোহিনুরের পড়াশোনার খোঁজখবর পর্যন্ত নিলেন। অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলোও নির্দিধায় জানাতে বললেন। তবে জরুরি একটা মিটিং থাকায় রাকিবের বিষয়ে সেদিন আর খুব একটা কথাবার্তা হলো না। অন্য একদিন আসতে বলে বিদায় দিলেন। আসার সময় বলে দিলেন যে, রাকিব আর কোহিনুরকে তিনি মুখোমুখি বসাতে চান। যাতে কোহিনুরের কাছে সেদিনের ঘটনার জন্য ক্ষমা চায় সে। আর এ কারণেই পরের দিন কোহিনুরকে একা যেতে বললেন নুরুল মোল্লা।

ওহ, গড! তার মানে সেদিনই ঘটনা ঘটিয়েছে সে ?

হুম। দুর্ঘটনা ঘটল সেদিনই। নুরুল মোল্লার প্রথম দিনের আচরণে মুগ্ধ হয়ে কোহিনুরের বাবা-মা সরল মনেই মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন। কোহিনুর গেল দুপুরবেলা। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেও কোহিনুরের কোনো খবর পাওয়া গেল না। ফিরল না সন্ধ্যাবেলাও। সন্ধ্যার পরপর কোহিনুরের বাবা তাকে খুঁজতে গেলেন নুরুল মোল্লার বাড়ি। বাড়ির কেয়ারটেকার অবশ্য জানাল নুরুল মোল্লা বাড়িতে নেই। তিনি জরুরি মিটিংয়ে জেলা শহরে গেছেন। চিন্তিত কোহিনুরের বাবা তার কাছেই কোহিনুরের কথা জানতে চাইলেন। কিন্তু কেয়ারটেকার জানাল, সে কোহিনুরকে দেখে নি। রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। ঘড়িতে তখন রাত দশটা। বাড়ি ফিরে দেখেন কোহিনুর ফিরে এসেছে। কিন্তু সেই কোহিনুর ফিরে না এলেই বোধহয় ভালো ছিল।

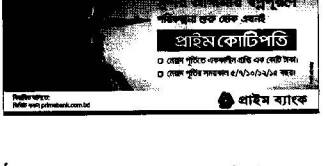

আজিজ মাস্টার থামলেন। আসাদ বলল, সেই রাতেই সে আত্মহত্যা করে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাহ। টানা বারো ঘণ্টা কোনো কথা বলে নি কোহিনুর। শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিল সারা রাত। তার মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে মরা কান্না কাঁদলেন। কিন্তু পরদিন দিনের আলো যত বাড়তে থাকল, কোহিনুরও যেন ততই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল। বিষয়টি অস্বাভাবিক ঠেকলেও কিছু বললেন না কোহিনুরের মা। বিকেলের দিকে হঠাৎ আমার বাড়িতে আসতে চাইল সে। তার মা নিজেই নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি জানতেন না, অমন ঘটনার পরও এমন শান্ত, স্বাভাবিক কোহিনুর আসলে ঠান্ডা মাথায় কী ঘটাতে যাচ্ছে! সেই রাতেই নিজের ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে সে!

আজিজ মাস্টার একটু দম নিয়ে যেন শক্তি সঞ্চয় করলেন। আসাদ উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তারপর ?

আজিজ মাস্টার ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, এরপর আমি পুলিশের কাছে গেলাম। সরাসরি ধর্ষণ ও হত্যা মামলা করতে চাইলাম নুরুল মোল্লার বিরুদ্ধে। কিন্তু পুলিশ আমার মামলা নিল না।

কেন ?

কারণ আমি ধর্ষিতার কেউ হই না।

কেউ না হলে মামলা করা যায় না ?

যাবে না কেন ? যায়। কিন্তু এটা একটা বাহানা। তারা আসলে মামলা নিবে না।

তারপর ?

তারপর আমি কোহিনুরের মাকে বললাম মামলা করতে।

সে রাজি হলো ?

প্রথমে হয় নি। কিন্তু আমি তো ছাড়ার বান্দা না। অনেক পীড়াপীড়িতে অবশেষে সে গেল মামলা করতে।

মামলা হলো ?

উঁহু।

কেন!

পুলিশ বলল, এই মামলার কোনো ভবিষ্যৎ নাই। কোনোভাবেই প্রমাণ করা যাবে না যে কোহিনুর ধর্ষিতা ছিল। সে মারা গেছে ততদিনে মাস পেরিয়েছে। শুধু মুখের কথায় তো হবে না, প্রমাণ থাকতে হবে।

আপনাদের কাছে তো প্রমাণ ছিলই। কোহিনুরের মায়ের স্টেটমেন্ট আর তার সাথে সেই চিঠিঠা!

চিঠিঠা আর নেই।

নেই মানে ?

সেদিনই আমি ওসিকে বললাম যে আমার কাছে প্রমাণ আছে। তিনি জানতে চাইলেন কী প্রমাণ ? আমি তাকে চিঠিঠা দেখালাম। তিনি চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখলেন। দীর্ঘসময় পর জিজ্ঞেস করলেন, এই চিঠি যে কোহিনুর লিখছে তার প্রমাণ কী ? আমি বললাম, কোহিনুরের হাতের লেখা সবাই চেনে। তিনি বললেন, আচ্ছা, এটা চেক করে দেখতে হবে। ততদিন পর্যন্ত চিঠি আমার কাছে থাকুক।

কিন্তু এই কাজ তো তার না! এই কাজ কোর্টের। কোর্টের কাজ কি পুলিশের ওসি করতে পারে ? পুলিশের কাজ মামলা নেওয়া। সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের ভার আদালতের।

আজিজ মাস্টার ম্লান হাসলেন, চিঠিঠা আর আমাকে ফেরত দিলেন না তিনি। মামলাও নিলেন না। উল্টো ভয় দেখালেন।

কীসের ভয় ?

সেটা আমি মুখে বলতে পারব না। এত নোংরা, এত জঘন্য!

বলুন, আমাকে শুনতে হবে।

আজিজ মাস্টার খানিক সময় নিলেন বলতে। রাজ্যের লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা নিয়ে তিনি বললেন, কোহিনুরের মা আর আমার মধ্যে আপত্তিকর সম্পর্ক ছিল, সেই কারণেই লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে কোহিনুর! এই কারণ দেখিয়ে আমার আর কোহিনুরের মায়ের নামে মামলা দিবে পুলিশ।

কী বলছেন আপনি!

হুম।

তারপর ?

তারপর আর কী! খানিক চুপ করে থেকে আজিজ মাস্টার আবার বললেন, এরপর আর কখনো কোহিনুরের মা আমার সাথে দেখা দিলেন না।

আজিজ মাস্টার তার কথা শেষ করলেও কথা বলল না আসাদ। চুপ করে রইলেন আজিজ মাস্টারও। ঘড়িতে তখন রাত তিনটা। দূরে কোথাও করুণ সুরে একটা কুকুর ডেকে যাচ্ছে। সেই ডাকে ভারী হয়ে উঠছে রাতের বাতাস।

পরদিন বেলা করে ঘুম ভাঙল দুজনেরই। আজিজ মাস্টার ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমিয়েছিলেন বলে আর ওঠার তাড়া ছিল না। তবে ঘুম থেকেই উঠেই কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। আসাদ বলল, এখন কী করবেন ?

কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন ধরাব।

কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন ধরাব মানে ?

এটা ছাড়া তো আসলেই আর কোনো উপায় নেই। এ ক'দিন আমি এই একটা বিষয়ই ভাবছি। আপনার এই বুদ্ধি ছাড়া আর কোনো বুদ্ধি আমার মাথায় আসে নাই।

আসাদ হতাশ ভঙ্গিতে হাসল, এই বুদ্ধিও কাজে লাগবে না।

কেন ? কাজে লাগবে না কেন ?

আগেভাগে ঘোষণা দিয়ে আগুন লাগাতে গেলে পুলিশ প্রেসক্লাবের সামনে আপনাকে দাঁড়াতেই দিবে না। ধরে জেলে ঢুকিয়ে দিবে।

তাহলে ?

তাহলে আর কী! আপনি কি সত্যি সত্যিই গায়ে আগুন জ্বালিয়ে মরতে চান নাকি ?

কেন ? আপনিই না বললেন, অত মানুষের ভিড়ে সেটা সম্ভব না। পাবলিক তো থামাবেই। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু প্রতিবাদটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

কিন্তু আপনি তো প্রথমেই ভুল করছেন। আপনার উচিত ছিল প্রথম থেকেই ব্যাগের ভেতরে রাখা ওই ব্যানার টানিয়ে আমরণ অনশনে বসে যাওয়া। তাহলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ হতো সহজে। আপনি সেটি না করে কী এক ব্ল্যাকবোর্ডে স্কুলের এমপিওভুক্তির দাবি জানিয়ে অনশনে বসে গেলেন। বিষয়টা হাস্যকর হয়ে গেল না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজ মাস্টার খানিক চুপ করে থেকে বললেন, আমি আসলে ভয় পাচ্ছিলাম, প্রথমেই যদি ওইটা নিয়ে বসে যাই, আর তা যদি নুরুল মোল্লা কোনোভাবে জেনে যায়, তাহলে কিছু একটা সে করবেই। এইজন্যই এটা দিয়ে প্রথমে এখানকার হাবভাব বোঝার চেষ্টা করছিলাম।

তো হাবভাব কী বুঝলেন ?

এই সাধারণ, নির্বিরোধী বিষয় নিয়েই পুলিশ যা করল, আর ওই বিষয় নিয়ে কিছু করলে তো ভয়াবহ অবস্থা হবে।

কথা সত্য। এই দেশে কোনো এক অদ্ভুত কারণে হয় ধর্ষণকারীরা শক্তিশালী হয়ে যায়, অথবা শক্তিশালী মাত্রই ধর্ষণকারী হয়।

আজিজ মাস্টার আর কোনো কথা বললেন না। তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। আসাদ বলল, একটা কথা বলি স্যার ?

জি বলেন।

যা হয়েছে, তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আপনার তো নিজের ঘর, সংসারও আছে, আছে না ?

জি আছে।

তাহলে একবার ভাবেন তো আপনার কারণে তারা এখন কত বড় বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ?

আজিজ মাস্টার কথা বললেন না। আসাদ বলল, যদি আপনার এই প্রতিবাদের কারণে আপনার মেয়েদের কোনো সমস্যা হয় ? ঘরে এখনো দুটো মেয়ে আপনার। তখন ? তখন বাবা হয়ে সেটা মেনে নিতে পারবেন ?

আজিজ মাস্টার এবারও জবাব দিলেন না। আসাদ বলল, যে অন্যের মেয়ের উপর ঘটা এমন ঘটনাই মেনে নিতে পারে না, সে নিজের মেয়ের উপর এমন ঘটনা ঘটলে কী করবে ?

দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে আজিজ মাস্টার কথা বললেন, কী করব তাহলে ?

আপনি বরং বাড়ি চলে যান। দেখেন স্কুলটার কোনোভাবে এমপিও করাতে পারেন কি না!

স্কুলের মেয়েদের যদি নিরাপত্তাই দিতে না পারি, তাহলে আর স্কুল রেখে লাভ কী ?

আসাদ চট করে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারল না। তবে সে আজিজ মাস্টারের কাঁধে হাত রেখে বলল, আপনি ভালো মানুষ। আমি আপনার যন্ত্রণা বুঝি স্যার। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কোহিনুর আপনার নিজের মেয়ে না। নিজের মেয়ে ?

নাহ।

তাহলে যাদের মেয়ে, তাদের উচিত ছিল না, বিষয়টা নিয়ে অনেক বেশি সোচ্চার হওয়া ?

জি।

তাহলে তারা যদি না হয়, আপনার এত দায় কিসের ? অন্যের মেয়ের জন্য চিন্তার আগে কি নিজের মেয়েদের জন্য চিন্তা করা উচিত না ?

আজিজ মাস্টার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে রইলেন। তবে তার চোখের সামনে তখন সত্যি সত্যিই তার মেয়েদের চেহারা ভেসে উঠেছে। বাড়িতে নিশ্চয়ই সবাই খুব দুশ্চিন্তা করছে। বাবার জন্য অপেক্ষায় আছে তারা। আচ্ছা, ওরা কি তার খোঁজে অস্থির হয়ে আছে ? নিশ্চয়ই আছে। কে জানে, হয়তো চারদিকে তার খোঁজে লোকজনও পাঠিয়েছে। আবার ঢাকা শহরও পৌঁছে যায় নি তো তারা ? কিন্তু ঢাকা শহরে পৌঁছালে কোথায় খুঁজবে তাকে ? এমন না যে তিনি ফোন ব্যবহার করেন আর সেই ফোনে তারা বাবাকে খুঁজে পাবে! তাহলে ? হঠাৎ মেয়েদের জন্য বুকের ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে গেল আজিজ মাস্টারের। কেমন আঁকুপাঁকু করতে লাগল।

আজিজ মাস্টার চুপচাপ বসে রইলেন। বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি। কিন্তু কোহিনুরের কথা মনে পড়তেই সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওই গ্রামটাতে ফিরে গেলেই কোহিনুর তার সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন তাকে কী জবাব দিবেন তিনি ? স্কুলে ক্লাস টেনের যে বেঞ্চিটাতে রোজ এসে বসত কোহিনুর, সেই বেঞ্চিটা চোখের সামনে রেখে কী করে পড়াবেন তিনি ? যে পথ ধরে মেয়েটা রোজ হেঁটে যেত, সেই পথ ধরে কী করে হাঁটবেন তিনি ?

আচ্ছা, সত্যি সত্যিই কি কোহিনুরের ঘটনার কোনো বিচার হবে না ? কোনো বিহিত হবে না ? কিছু করতে পারবেন না তিনি ? অন্তত একটু প্রতিবাদও না ? এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না আজিজ মাস্টার। ভাবতেই বুকের ভেতরটা কী এক অক্ষম আক্রোশে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। জানেন, কিছুই করার নেই তার। তারপরও ডুবে যাওয়া মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়, তেমন করেই তিনি আসাদকে বললেন, আপনি কি কিছু করতে পারেন না আসাদ সাহেব ? আপনি তো লেখেন। কবিতা, গল্প। লিখেও তো কত কিছু হয়! কত প্রতিবাদ, কত দাবি আদায়। হয় না ?

আসাদ ম্লান হাসল, এই দেশে হয় না। এখানে লিখে, গান গেয়ে, মানববন্ধন করে প্রতিবাদ করলে মানুষ ভাবে প্রতিবাদের শক্তি নেই বলে এগুলো করা হচ্ছে। কিংবা যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হচ্ছে সেটা গুরুতর কোনো অন্যায় নয়। এগুলো লোকদেখানো। আর নীতিনির্ধারক বা শাসকরাও এগুলোকে গুরুত্বহীন ভাবেন। ফলে এগুলো করে কিছু হবে না।

আসলেই হবে না ?

কোনো একদিন হয়তো হবে। এখন তো হয় না। দেখেন নি, সাগর রুনি হত্যার ঘটনায় কত লেখালেখি হলো, কত মানববন্ধন হলো, কই তাতে কিছু হলো ? আজ কত বছর ? হলো না তো কিছুই! তনু ধর্ষণ হত্যার ঘটনা জানেন ? জানেন নিশ্চয়ই। এমন আরও কত শত ঘটনা যে রয়েছে। কই ? কিছুই তো হয় নি! এই যে কত লেখালেখি, কত মানববন্ধন, প্রতিবাদ হলো কিন্তু কিছু হলো না তো!

তাহলে ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না আসাদ। সে চুপ করে রইল। চুপ করে রইলেন আজিজ মাস্টারও। সারা দিন আর কোনো কথা বললেন না তিনি। তবে বিকেল নাগাদ বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন আজিজ মাস্টার। তার এখন সত্যি সত্যিই নিজের মেয়েদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। অস্থির লাগছে।

পরদিন ভোরে তাকে বাড়ি যাওয়ার গাড়িতে তুলে দিল আসাদ। তবে পুরোটা সময় সে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। এই অদ্ভুত মানুষটাকে সে কোনোদিন ভুলবে না। এই মানুষটার সঙ্গে এই জীবনে আর কখনো দেখা হবে কি না আসাদ জানে না, তবে সে এটা জানে, এই মানুষটা হুটহাট তার গল্প, কবিতা, ভাবনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচরণ করে যাবেন। সে হঠাৎ মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, মাঝেমধ্যেই আজিজ মাস্টারের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সে মানুষটার সঙ্গে দেখা করে আসবে। আর ফেরার সময় নিয়ে আসবে অদ্ভুত এক শক্তি।

আজিজ মাস্টারকে বিদায় দেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তিনি হঠাৎ আসাদের হাত চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, একটা কথা ?

কী কথা ?

আপনি যে বললেন কোহিনুর আমার মেয়ে না। এইজন্য আমার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত ? তাই না ?

আসাদ এই প্রশ্নের কী উত্তর দিবে সে জানে না। তারপরও সে বলল, ঠিক তা না। আমি আসলে বলতে চেয়েছি, আপনার যদি কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে তারা কী করবে ?

কী করবে ?

আপনিই জানেন, তারা কী করবে!

হ্যাঁ জানি। তারা কান্নাকাটি করবে। পিতৃহারা হয়ে কষ্ট পাবে। কিন্তু আসাদ সাহেব...।

জি বলুন।

তাদের কারও কিছু হলে আমি কী করব ?

কিছু হলে মানে ?

ধরুন, যদি কোহিনুরের মতো কিছু হয়ে যায় ?

এমন কিছু হবে না। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

কিন্তু যদি হয়ে যায় ? তাহলে অন্য সব বাবারাও তো এটাই ভাববে যে তাদের ঘরে তো তাদের মেয়েরা ভালো আছে। তাই না ? বা তাদের সন্তানরা তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করবে। তাদের কিছু হয়ে গেলে কাঁদবে, পিতৃহারা হবে। এই ভেবে তারাও আমার মতো বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু আমি একা তখন কী করব ? আমি তো বাবা ?

আসাদ এই প্রশ্নের জবাব দিল না। আজিজ মাস্টার হঠাৎ হাসলেন, ওহ, আমি বারবার শুধু ভুলে যাই, আমি তো শুধু আমার মেয়েদের বাবা। আমি তো অন্য মেয়েদের বাবা নই। আমি তো কোহিনুরেরও বাবা নই। তাই না আসাদ সাহেব ?

আসাদ এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আজিজ মাস্টারের দিকে। লোকটাকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে। কেমন অচেনা অন্যরকম লাগছে।

আসাদ ঘরে ফিরল তার কিছুক্ষণ পরেই। তার ঘরের মেঝেতে আজিজ মাস্টারের রেখে যাওয়া হলুদ ব্যানারখানা পড়ে আছে। কোহিনুরের হত্যার বিচার চেয়ে এই ব্যানারখানা তিনি বানিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও এটা প্রদর্শনের সুযোগ তার হয় নি। আর কোনোদিন হবেও না। হয়তো এ কারণেই ব্যানারখানা ফেলে রেখে গিয়েছেন তিনি। কে জানে, এই ব্যানারের সঙ্গে হয়তো তিনি ফেলে রেখে গেছেন তার যাবতীয় ক্ষোভ, ক্রোধ আর প্রতিবাদের শক্তিও। তাহলে যে শক্তিমান মানুষটা এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরে পা রেখেছিল অসম্ভব প্রতিবাদের এক স্বপ্ন নিয়ে, সেই মানুষটাই ফিরে যাচ্ছেন স্বপ্নহীন, শক্তিহীন, নিঃস্ব হয়ে ? আসাদ ব্যানারের ভাঁজটা খুলল।

ভেতরে স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে লেখা, কোহিনুর ধর্ষণ ও হত্যার বিচার চাই।

প্রতিবাদমুখর এই শব্দগুলো পেছনে ফেলে রেখে শূন্য বুকে ফিরে গেছেন আজিজ মাস্টার। এক পরাজিত, বিধ্বস্ত, নিঃসঙ্গ একা মানুষ।

পরিশিষ্ট

স্থান : ঢাকা প্রেসক্লাব। সময় : বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

এই সময়ে প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় অফিসছুট ক্লান্ত মানুষের সারি থাকে। আজও রয়েছে। তবে আজকের ভিড়টা আর আর দশদিনের মতো নয়। প্রেস ক্লাবের সামনে লোকজন জমে গিয়ে বড়সড় একটা জটলা লেগে গেছে। সেই জটলার ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে ভিড় চলে এসেছে রাস্তা অবধি। অফিসফেরত বাসযাত্রীদের বাসগুলো ধীরে ধীরে আটকে পড়তে শুরু করেছে সেই ভিড়ে। ক্রমশই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে রাস্তার জ্যাম। কৌতূহলী মানুষ তাদের জরুরি কাজ ফেলে রেখে ভিড়ের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে সামনের উঁচু মাথাগুলোর জন্য তারা আসল ঘটনার কিছুই দেখতে পারছে না। ফলে কেউ কেউ উঠে গেছে ওভার ব্রিজের উপরে। দুয়েকজন তরতর করে রেইনট্রি গাছের ডাল বেয়ে উঠে গেছে উপরে। আশপাশের বাসা, অফিসের ছাদেও উৎসুক মানুষের ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা কী ?

ঘটনা হলো ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়ানো শীর্ণকায় শরীরের মানুষটা। মানুষটার নাম আজিজ মাস্টার। আজিজ মাস্টার গায়ে কেরোসিন ঢেলে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসক্লাবের সামনে। তার বাঁ হাতে ধরা একখানা মশাল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মশাল থেকে গায়ে আগুন ধরাবেন। কিন্তু একটু দেরি করছেন। কারণ তার গলায় একখানা ছোট ব্ল্যাকবোর্ড ঝোলানো। সেই ব্ল্যাকবোর্ডে চক ঘষে স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে লেখা—

আমি কোহিনুরের বাবা।
কোহিনুর আমার মেয়ে।
আমি তার ধর্ষণ ও হত্যার বিচার চাই।

নিচে ধর্ষকের নাম-পরিচয়সহ বিস্তারিত লেখা।

এই ঘটনার কথা আসাদ এখনো জানে না। সে ভোরে আজিজ মাস্টারকে বাসে তুলে দিয়ে বাসায় ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু আজিজ মাস্টার শেষ অবধি বাড়ি ফিরে যান নি। আসাদ চলে যেতেই তার হঠাৎ কী যে হলো! কিছুদূর যেতেই কন্ডাক্টরকে অনুরোধ করে চলন্ত বাস থামিয়ে তিনি বাস থেকে নেমে পড়লেন। আসলে আসাদের কথাটা তার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। তিনি কিছুতেই বিষয়টা মাথা থেকে তাড়াতে পারছিলেন না। বাসে ওঠার পরপরই হঠাৎ তার মনে হলো, এভাবে তিনি বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন না। এমনকি এভাবে ফিরে গেলে তিনি মরেও শান্তি পাবেন না। বাকি জীবনও বেঁচে থাকবেন প্রবল অশান্তি নিয়ে। স্বস্তিতে ঘুমাতে পারবেন না আর কখনো। যে-কোনো উপায়েই হোক, এই ঘটনার প্রতিবাদ তিনি করবেনই। এই ঘটনার বিচার তিনি চাইবেনই।

আজিজ মাস্টার সোজা চলে এসেছেন প্রেস ক্লাবের সামনে। এক টিন কেরোসিন কিনে গায়ে মেখেছেন। একটা মশাল জ্বালিয়ে ধরে রেখেছেন এক হাতে। তবে তিনি গায়ে আগুন লাগানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি। আসাদের মতো তাঁরও ধারণা, শেষ মুহূর্তে এসে জনগণ তাকে নিবৃত্ত করবে। কিন্তু তাঁর এই প্রতিবাদ, এই ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি দেখে তিনি ঘাবড়ে গেছেন। যদিও তার প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। চারপাশে একটা হৈহৈ রব উঠে গেছে। শতশত মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। আরও মানুষ আসছে। তাদের প্রায় সবার হাতেই মোবাইল ফোন, ক্যামেরা। তারা প্রবল উত্তেজনা নিয়ে ঘটনা ঘটার অপেক্ষা করছে। লোকজনের এমন আগ্রহ দেখে প্রচুর সাংবাদিকও জড়ো হয়েছেন। তারাও ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত। টিভি সাংবাদিকদের আসতে অবশ্য একটু দেরি হচ্ছে। তারা আজিজ মাস্টারের এই অভিনব প্রতিবাদ সরাসরি সম্প্রচার করবে।

চারপাশের পরিস্থিতি দেখে আজিজ মাস্টার অবশ্য ভীত হয়ে পড়েছেন।

এত এত মানুষের জমায়েত দেখে তিনি ভেবেছিলেন, তার এই প্রতিবাদ এমপি-মন্ত্রী অবধি পৌঁছে যাবে। তারা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে আসবেন। কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী কাউকে পাঠাবেন। ভাগ্য ভালো হলে প্রধানমন্ত্রীও তার দাবির স্বপক্ষে বিবৃতি দিয়ে ফেলতে পারেন। অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি, তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা এবং এত এত সাংবাদিকের উপস্থিতি দেখে তিনি এ বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিতই ছিলেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার হিসেবে বড় ধরনের গড়মিল ছিল। কেউতো আসেই নি বরং উপস্থিত সকলেই যেন অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, কখন আজিজ মাস্টার তার গায়ে আগুন ধরাবেন!

আজিজ মাস্টারের পেছনে কতগুলো চ্যাংড়া ছেলেপুলে দাঁড়ানো। তাদের হাতে মোবাইল ফোন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তারা উসখুশ করছিল। এবার পেছন থেকে তাদের একজন বলেই ফেলল, কী হইল স্যার ? দেরি করতেছেন কেন ? আমার ইন্টারনেটের ডাটাতো শেষ, কতক্ষণ আর এমনে ফেসবুকে লাইভ ধইরা থাকবো ? ধরাইলে ধরান।

আজিজ মাস্টার এই ডাটার বিষয়টি ভালো বোঝেন না। তবে ফেসবুকের কথা তিনি শুনেছেন। তার ছোট মেয়েটা বায়না ধরেছিল মোবাইল ফোনের। তাও আবার ইন্টারনেটওয়ালা মোবাইল ফোন। আজিজ মাস্টার কিনে দিবেন দিবেন করেও আর দিতে পারেন নি। দিবেন কী করে ? বাপ-দাদার ভিটে বাড়ি যা ছিল, তা বিক্রি করে তিনি ওই স্কুলখানাই করেছেন। বছরের পর বছর সেই স্কুল চালাতে গিয়ে তার দিশেহারা অবস্থা।

দিশেহারা অবস্থা এই মুহূর্তেও। মানুষজন ক্রমেই যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। টিভি ক্যামেরাও চলে এসেছে। তারা আজিজ মাস্টারের এই অভিনব প্রতিবাদ লাইভ সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতিও নিয়ে এসেছে। আজিজ মাস্টার তার বাঁ দিকে একটা ছোটখাটো জটলা দেখতে পেলেন। কিছু তরুণ শিক্ষার্থী সেখানে জড়ো হয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে ঝাঁকড়া চুলের, পাঞ্জাবি পরা একজন উঁচু এক স্তম্ভের উপর উঠে গেল। তারপর গলার রগ শক্ত করে, উঁচু গলায় বক্তৃতা দেওয়া শুরু করল। আজিজ মাস্টার অবশ্য তাদের বক্তৃতার কারণ বুঝলেন না। তবে মনে মনে খানিক শঙ্কিত বোধ করলেন তিনি। যদি কোনো কারণে তার প্রতিবাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

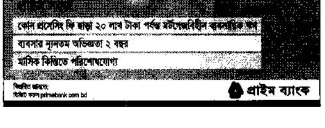

বিষয়টি থেকে মানুষের দৃষ্টি সরে যায়! যদিও তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বরং মনে হলো তাদের কারণেই আরও অনেক বেশি মানুষ আজিজ মাস্টারকে কেন্দ্র করে জটলা বাড়িয়ে চলেছে।

আজিজ মাস্টারের শরীর খারাপ লাগছে। এতক্ষণ প্রচণ্ড রোদ ছিল। আর এখন ভিড়ের কারণে ঘামে, গরমে তার নাভিশ্বাস অবস্থা। মনে হচ্ছে, যে-কোনো সময় তিনি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যাবেন। তা ছাড়া তার হাতের মশালটিও এভাবে এতক্ষণ ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার। একটু উল্টোপাল্টা কিছু হলেই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পরে। আজিজ মাস্টার এখন সত্যি সত্যিই ভয় পাচ্ছেন। আর যা-ই হোক, জীবন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে মরার মতো সাহস তার নেই। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে না, কেউ তাকে নিবৃত্ত করতে আসবে। বরং সকলেই যেন সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা করছে। কখন আজিজ মাস্টার তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিবেন। আর অপেক্ষমাণ এই শত শত মানুষ তার গায়ে আগুন লাগানোর সেই দৃশ্য ক্যামেরায়, মোবাইল ফোনে ধারণ করবেন। তারপর ফেসবুক, ইউটিউব, টেলিভিশনে ছড়িয়ে দিবেন। অজস্র মানুষ সেই ঘটনায় কমেন্টস, লাইক, শেয়ার করবে। কী ভয়ঙ্কর!

আজিজ মাস্টারের শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে। তিনি খুব করে চাইছেন, কোনো এক অলৌকিক উপায়ে হলেও কবি আসাদ যদি এখানে ছুটে আসত! তাহলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা সে করে ফেলতে পারত। কিন্তু এই তুমুল ভিড়ের মধ্যে কোথাও আসাদকে দেখতে পেলেন না তিনি। পেছন থেকে এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করল, আপনি ঠিক ক'টা নাগাদ আত্মহত্যা করবেন ?

আজিজ মাস্টার ঘুরে সাংবাদিকের দিকে তাকালেন। সাংবাদিক তার মুখের কাছে মাইক্রোফোন এগিয়ে দিলেন। তার পেছনে একজন ক্যামেরা ধরে আছেন। আজিজ মাস্টার তার কথার উত্তর দিচ্ছেন না দেখে সাংবাদিকটি আবারও প্রশ্ন করলেন, কেউ যদি আপনার দাবি মেনে না নেয়, তাহলে আপনি কি সত্যি সত্যিই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করবেন ? করলে কখন ? কোনো টাইমলাইন কি আপনি বেঁধে দিয়েছেন ?

আজিজ মাস্টার এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। একগ্লাস পানি পেলে ভালো হতো। কিন্তু যে মানুষ গায়ে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার হুমকি দিয়েছে, সেই মানুষটি এই অবস্থায় কারও কাছে তেষ্টা নিবারণের জন্য জল চাইতে পারে না। সেটি ভালোও দেখায় না।

সাংবাদিকটি তাঁর কাছে কোনো জবাব না পেয়ে আবার রিপোর্টিংয়ে ফিরে গেলেন, 'প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একজন স্কুল শিক্ষক কতটা মহান, কতটা সৎ, বিবেকবান হলে তার ছাত্রীর ধর্ষণের প্রতিবাদে এমন সোচ্চার হতে পারেন। নিজেকে সেই ছাত্রীর বাবা হিসেবে দাবি করতে পারেন। এমন একনিষ্ঠ হতে পারেন। এমনকি তিনি যে শুধু দেখানোর জন্যই এমন প্রতিবাদ করছেন তা নয়, বরং সত্যি সত্যিই করছেন, তা তাঁর এই নির্বিকার, নির্বাক প্রতিক্রিয়ায়ই স্পষ্ট। তিনি আমাদের মতো কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সংশ্লিষ্ট মহলের কাউকেই এখনো এখানে দেখা যাচ্ছে না। এভাবেই...।'

আজিজ মাস্টার আর শুনতে পেলেন না সাংবাদিকটি কী বলছেন! তবে তিনি বুঝতে পারছেন তার চারপাশের মানুষগুলো আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। তারা ক্রমেই আরও অস্থির হয়ে উঠছে। যেন মজার কোনো দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় তারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এই সবকিছুই অর্থহীন। আজিজ মাস্টার আসলে কিছুই করবেন না। বরং সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি নিজেই এক ধরনের মজা লুটছেন।

লম্বা লেন্সের ক্যামেরা হাতে এক লোক দূর থেকে আজিজ মাস্টারকে ডাকল, স্যার, স্যার।

আজিজ মাস্টার বুঝলেন না কোন দিক থেকে কে তাকে ডাকছে। তবুও তিনি শব্দ লক্ষ করে ফিরে তাকালেন। লোকটা আবারও চিৎকার করে বলল, স্যার। এইদিকে স্যার। এই যে, আপনের ডানে, একটু তাকান স্যার। জি, স্যার। একটু মুখটা শক্ত করে হাতটা উঁচু করেন স্যার, জি স্যার।

আজিজ মাস্টার কিছুই বুঝলেন না। তবে ছেলেটা একের পর এক ক্যামেরার শাটার টিপতে লাগল। আজিজ মাস্টার এতক্ষণে খেয়াল করলেন, অসংখ্য মানুষ মোবাইল ফোনেও তার ছবি তুলছেন। অনেকে ধীরে ধীরে তার একদম কাছেও চলে এসেছে। তারা আজিজ মাস্টারের সঙ্গেও ছবি তোলার চেষ্টা করছে। আজিজ মাস্টার না বুঝলেও তিনি অসংখ্য মানুষের সেলফিতে স্থান পেয়ে যেতে থাকলেন। একটি মেয়ে তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে লম্বা সেলফি স্টিক বের করে সেলফি তুলতে লাগল। কিন্তু সে তার সেলফিতে মোটেই সন্তুষ্ট হচ্ছিল না। বরং ডানে বাঁয়ে মাথা, মুখ, ঠোঁট কাত কিংবা আঁকা-বাঁকা করেও সে তার কাঙ্ক্ষিত ছবিটি পাচ্ছিলই না। অবশেষে সে আজিজ মাস্টারকে বলল, আংকেল, একটু তাকাবেন প্লিজ ?

আজিজ মাস্টার হতভম্ব চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা সম্ভবত বুঝতে পারল যে এখানে এই মুহূর্তে এমন আবদার করাটা তার ঠিক হয় নি। তা ছাড়া সে সময়ও নিয়ে ফেলেছে অনেক। ফলে তার চারপাশের লোকজনও তার উপর বিরক্ত হয়ে উঠছিল। মেয়েটা তড়িঘড়ি করে দূরে সরে গেল। তবে এরপরই শুরু হলো সেলফি তোলার হিড়িক। আজিজ মাস্টার অবশ্য জানেন না কী ঘটছে। তার খুব অসুস্থ লাগতে লাগল। মাথা ঘোরাচ্ছে। তিনি ভিড় থেকে খানিক দূরে সরে যেতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। কেউই তাকে সামান্য জায়গাও দিচ্ছিল না।

আজিজ মাস্টার হঠাৎ হড়বড় করে বমি করে ফেললেন। তার পাশের লোকটা ছিটকে দূরে সরে গেল। কিন্তু আজিজ মাস্টার আর তাল সামলাতে পারলেন না। তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি দুপা এলোমেলো সামনে বাড়ালেন। তারপর ধপাস করে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, তার হাতের মশালটা ছিটকে এসে পড়ল তার শরীরে। আর মুহূর্তেই কমে এলো চারপাশের ভিড়। মোবাইল হাতের সেলফি শিকারিরা ছুটে সরে গেল দূরে। কারণ ততক্ষণে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। আজিজ মাস্টারের তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তার গায়ে সত্যি সত্যিই আগুন লেগে গেছে! তিনি চিৎকার করে সাহায্য চাইতে গিয়েও আচমকা থমকে গেলেন। শত শত মানুষ তার চারপাশে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সকলের হাতেই মোবাইল ফোন। তারা প্রবল আগ্রহ আর একাগ্রতার সঙ্গে আজিজ মাস্টারের ছবি তুলছে। এমন দৃশ্য তারা কেউই এর আগে কখনো দেখে নি। তাদের চোখের সামনে জীবন্ত একজন মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। বিষয়টি কেউ কেউ ভিডিও করছে।

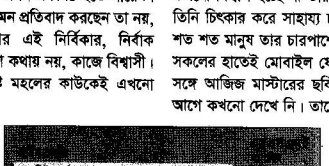

টেলিভিশনে এই দৃশ্য লাইভ সম্প্রচারিত হচ্ছে। লাইভ হচ্ছে ফেসবুক ইউটিউবেও। অসংখ্য মানুষ দেখছে একজন প্রতিবাদী শিক্ষক, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলছাত্রীর ধর্ষণের প্রতিবাদে সত্যি সত্যি গায়ে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করছেন। তারা সেই ভিডিও ছবির নিচে তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া, আবেগঘন মতামত জানাচ্ছেন। লাইক শেয়ার করছেন। মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে। আজিজ মাস্টার তাকিয়ে আছেন, তার চোখের সামনের দৃশ্য ক্রমশই ঝাপসা হয়ে উঠছে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, যে তীব্র যন্ত্রণা তিনি শুরুতে পেয়েছিলেন, এখন আর তা অনুভব করছেন না। আজিজ মাস্টারের হঠাৎ মনে হলো, এই ঘটনা বাস্তবে ঘটছে না, এই ঘটনা ঘটছে স্বপ্নে। তার স্বপ্ন দেখার অসুখ আছে। ওই যে তাঁর বাবা দবির খাঁ, দবির খাঁকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। দবির খাঁ লাঠি হাতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। বাবাকে দেখে আজিজ মাস্টারের খুব ভয় লাগতে লাগল। তিনি নিশ্চিত এই অবস্থায়ও তাঁর বাবা তাকে বকাঝকা করবেন। বলবেন, 'কিরে বেকুব, শেষ পর্যন্ত অন্যের মেয়ের জন্য নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিলি! নিজের মেয়েদের কথা একবারও ভাবলি না ?'

আজিজ মাস্টার তার বাবা দবির খাঁকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পারলেন না।

আজিজ মাস্টারের লাশ রাখা হয়েছে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে। তিনি মারা গেছেন গতকাল রাতে। খবর পেয়ে গ্রাম থেকে রফিকুল এসেছে। রফিকুলের সঙ্গে এসেছে আজিজ মাস্টারের স্ত্রী এবং সন্তানরাও। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তারা কেউই এখনো লাশ দেখতে পারেন নি। এমনকি হাসপাতাল থেকে লাশ বেরও করা যায় নি। না করার পেছনে সঙ্গত কারণও রয়েছে। হাসপাতালের বাইরে অসংখ্য মানুষ ভিড় করেছে। মানুষের ভিড়ে গিজগিজ করছে চারপাশ। হাজার হাজার মানুষ। আজিজ মাস্টারের মৃত্যুর ঘটনা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়েছে দেশব্যাপী।

গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় আজিজ মাস্টারকে নিয়ে অসংখ্য পোস্ট গেছে ফেসবুকে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্পেশাল বুলেটিন প্রচার করেছে তাকে নিয়ে। সংবাদপত্রগুলো তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে আজিজ মাস্টারের ছবি ও আত্মহত্যার খবর দিয়ে। ফেসবুকে হাজার হাজার ইভেন্ট খোলা হয়েছে। সেই ইভেন্টে সাড়া দিয়ে ঢাকা শহরের মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। একজন শিক্ষক তার ছাত্রীর ধর্ষণের বিচার না পেয়ে প্রতিবাদ হিসেবে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে, কী ভয়ঙ্কর ঘটনা! মানুষের মুখে মুখে একই প্রশ্ন, কোন বিচারহীনতার দেশে আমরা বাস করছি ? এ কোন দেশ, যেখানে ধর্ষকমাত্রই শক্তিশালী হয়ে ওঠে ? আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়!

ঘটনা ঘটার সময়ও বোঝা যায় নি এর প্রভাব এত তীব্র হতে পারে! পুলিশ ভেবেছিল, আর দশটা অপঘাতে মৃত্যুর মতোই আজিজ মাস্টারের মৃত্যুও খানিক আফসোসের হবে, খানিক হাহাকারের হবে, খানিক প্রতিবাদের হবে। তারপর সব শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আজিজ মাস্টারের মৃত্যুর তৃতীয় দিন সকাল নাগাদ বোঝা গেল এই ঘটনা আর আর দশটা ঘটনার মতো নয়। রাতভর ঢাকা মেডিকেল থেকে শহিদ মিনার, টিএসসি থেকে শাহবাগ, বুয়েট থেকে পলাশী, ইডেন, নিউমার্কেটে হাজার হাজার মানুষ জেগে রইল। তাদের মিছিলে-স্লোগানে প্রকম্পিত হতে লাগল শহর। আজিজ মাস্টার যেন মুহূর্তেই হয়ে উঠলেন সমগ্র বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রতিবাদের একমাত্র প্রতিনিধি।

পুলিশ কমিশনার জরুরি সভা ডাকলেন। কিন্তু সেই সভায় এই সমস্যার কোনো সমাধান মিলল না। বরং পরিস্থিতি আরও জটিল হলো। পরপর দুদিন শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট বন্ধ থাকার কারণে যানজটে নাকাল অবস্থা হলো নগরবাসীর। অফিস-আদালত বন্ধ হওয়ার জোগাড় হলো। পুলিশ চেষ্টা করেছিল লাঠিচার্জ, টিয়ারশেলের মতো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাস্তা থেকে মানুষকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু এটি হিতে-বিপরীত হলো। মানুষ আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মিছিলে আজিজ মাস্টারের বড় বড় ছবি দেখা গেল। সেই ছবির নিচে কবিতার দুটো লাইন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

কবিতাটা লিখেছে কবি আসাদ। আজিজ মাস্টারের ঘটনা শোনার পর সে পাগলের মতো ছুটে এসেছিল। কিন্তু আজিজ মাস্টারকে সরাসরি একপলক দেখতে পারে নি সে। তবে ফেসবুকে ততক্ষণে অসংখ্য ছবি ছড়িয়ে পড়েছে আজিজ মাস্টারের। ফেসবুকের ভায়োলেন্স সংক্রান্ত পলিসির কারণে তার আগুনে পোড়া বেশির ভাগ ছবিই মুছে ফেলেছে তারা। তবে গায়ে কেরোসিন ঢেলে এক হাতে মশাল আর গলায় 'আমি কোহিনুরের বাবা। কোহিনুর আমার কন্যা। আমি তার ধর্ষণ ও হত্যার বিচার চাই' লেখা ব্ল্যাকবোর্ড ঝোলানো আজিজ মাস্টারের ছবিটি আসাদ দেখেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেই ছবি দেখে বহুকাল পরে তার মাথায় কবিতা চলে এল। ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করে তার নিচে সে সেই দুই লাইন কবিতা লিখে দিল—

সেই সে মিছিলে, তুমিও কি ছিলে, নাকি ছিল শুধু একা কেউ ?
জেনে রেখো আজ, একা এ আওয়াজ, হবে শত সহস্র ঢেউ!

সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ এক আজিজ মাস্টারের একা মিছিলের নিঃশব্দ আওয়াজ যেন ক্রমশই শত সহস্র মানুষের কণ্ঠস্বর, প্রতিবাদের ঢেউ হয়ে উঠতে লাগল।

ঘটনার তৃতীয় দিন রাতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ডাকলেন। দীর্ঘ মিটিং শেষে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে থমথমে মুখে বের হয়ে এলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেইদিন রাতেই কোহিনুর ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ চেয়ারম্যান নুরুল মোল্লা। সঙ্গে গ্রেপ্তার হলো তার ছেলে রাকিব ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাও। অভিযুক্তের মামলা না নেওয়া ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার করা হলো স্থানীয় ওসিকেও।

সপ্তাহখানেকের মাথায় দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাই স্কুল এমপিওভুক্ত করল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতকিছুর পরও অবশ্য আজিজ মাস্টারের ঘটনা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ, প্রতিবাদ স্তিমিত হলো না। তাঁকে নিয়ে ক্রমাগত লেখা হতে লাগল পত্রিকায়। টেলিভিশন টক শোর অবধারিত টপিক হয়ে উঠলেন মৃত আজিজ মাস্টার। তার সাহস, সততা, প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে গল্প, কবিতা, গান, নাটক, বই প্রকাশিত হতে লাগল। ঘটনার মাস দুয়েক পর সরকার থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের পাশেই আজিজ মাস্টার মেমোরিয়াল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। কারণ এই অঞ্চলে বহুদিন ধরেই একটি কলেজের খুব প্রয়োজন ছিল। যত দ্রুতসম্ভব সেই প্রয়োজন মেটানো হবে। কলেজের সামনে আজিজ মাস্টারের একটি আবক্ষ ভাস্কর্যও স্থাপন করা হবে। দেশসেরা একজন ভাস্কর সেই ভাস্কর্য তৈরি করবেন।

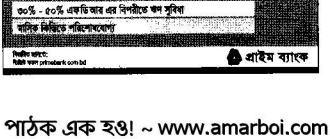

কবি আসাদের অদ্ভুত একটা অসুখ করেছে। সেই অসুখের নাম আজিজ মাস্টার অসুখ। সে আজিজ মাস্টারকে না দেখলে কবিতা লিখতে পারে না। আজিজ মাস্টারকে বাস্তবে দেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সুযোগ নেই। তাকে দেখতে হয় স্বপ্নে। স্বপ্নে তিনি আসাদকে সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। সেইসব কথাই কেমন কেমন করে যেন আসাদের কলমে কবিতা হয়ে যায়। সমস্যা হচ্ছে, ইচ্ছে করলেই যখন তখন আজিজ মাস্টারকে স্বপ্ন দেখতে পারে না আসাদ। আজিজ মাস্টারকে স্বপ্ন দেখতে হলে তাকে আজিজ মাস্টারের গ্রামে যেতে হয়। গিয়ে তার কবরের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তা আসাদ যায়ও। প্রায়ই সে আজিজ মাস্টারের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাঁর কবরের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁর সঙ্গে মনে মনে কথা বলে। খুবই আশ্চর্য ঘটনা, সেই রাতেই সে আজিজ মাস্টারকে স্বপ্ন দেখে। আর তার পরদিন খাতা ভরে কবিতা লিখতে থাকে সে।

মাঝেমধ্যে আসাদের সঙ্গে রফিকুলের কথা হয়। রফিকুল আজিজ মাস্টারের মেজো মেয়ে রুমুকে বিয়ে করেছে। দবির খাঁ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক হিসেবে তার সুনামও হয়েছে। শোনা যাচ্ছে আজিজ খাঁর নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হলে রফিকুল সেখানেই বাংলার প্রভাষক হিসেবে চাকরিও পেয়ে যাবে।

আসাদ এলে রফিকুল প্রায়ই আসাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। এটা সেটা জিজ্ঞেস করে। আজও এল। অনেকক্ষণ আজিজ মাস্টারের কবরের পাশে আসাদের সঙ্গে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বলল, একটা ঘটনা শুনেছেন আসাদ ভাই ?

কী ঘটনা ?

স্যারকে নাকি পুরস্কার দেওয়া হবে ?

কোন স্যারকে ?

যাঁর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওহ, আচ্ছা। আসাদ আগ্রহ দেখায় না।

রফিকুল আবার বলে, কথা সত্যি। আমাকে সেদিন আমাদের লোকাল এমপি সাহেব জানালেন। তিনি বড় মন্ত্রী-আমলাদের কাছে এই নিয়ে তদবিরও করেছেন। বিষয়টিকে সবাই পজেটিভলি নিয়েছে।

হুম।

আরে বুঝলেন না! এটার একটা পলিটিক্যাল ভিউও তো আছে!

কী রকম ?

স্যার তো এখন একভাবে জাতীয় আইকন। উনাকে একটা পুরস্কার দেওয়ার মানে তো সরকারেরই লাভ। পাবলিক সিম্প্যাথিও পেল। বুঝলেন না ?

হুম।

তবে যেই সেই পুরস্কার না কিন্তু, দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার।

পুরস্কার উনাকে কীভাবে দিবে ?

কীভাবে দিবে মানে ?

না মানে উনার লাশ কবর থেকে তুলে পুরস্কার প্রদানের মঞ্চে নিয়ে যাবে ? নাকি উনারা কবরের কাছে এসে লাশের গলায় পরিয়ে দিয়ে যাবেন ?

মানে! কী যা তা বলছেন আপনি ? রফিকুল যেন খানিক বিরক্ত হলো।

আসাদ অবশ্য জবাব দিল না। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে মেঘ। যে-কোনো সময় তুমুল বৃষ্টি শুরু হবে। রফিকুল বলল, স্যারের এত বড় প্রাপ্তিতে আপনি খুশি হন নি ?

খুশি হব না কেন ? হয়েছি।

তাহলে ?

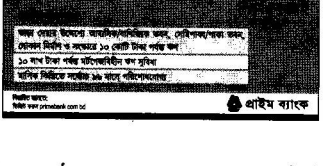

তাহলে কী ?

এমন নির্বিকারভাবে জবাব দিচ্ছেন কেন ?

আপনার কী মনে হয়, আপনার স্যার এই খবর পেলে তিনি কীভাবে জবাব দিতেন ?

উনি খুবই খুশি হতেন।

কী কী কারণে খুশি হতেন।

এই যে কোহিনুরের ঘটনার বিচার হলো, নুরুল মোল্লার ফাঁসি হলো। উনার স্কুল এমপিওভুক্ত হলো। কলেজ হলো। উনি এত বড় পুরস্কার পেলেন।

আচ্ছা।

আচ্ছা মানে ?

আসাদ একদলা থুথু ফেলে বলল, আচ্ছা মানে আচ্ছা।

সে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। রফিকুল তার পিছু পিছু আসতে লাগল। আসাদ আচমকা রফিকুলের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার স্যার কেমন লোক ছিলেন ?

তার মতো ভালো লোক আর আমি দেখি নাই।

তাহলে আপনার স্যারকে যদি বলা হতো, এই দেশে একটা ধর্ষণের বিচার পাওয়ার জন্য, একজন জঘন্য অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য একজন নিরপরাধ মানুষকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরতে হবে, তাহলে আপনার স্যার খুশি হতেন ?

রফিকুল চোখ তুলে তাকাল। আসাদ বলল, সব শর্ত পূরণ করার পরও একটা স্কুলের এমপিওভুক্তির জন্য একজন শিক্ষকের মরতে হবে, তাহলে আপনার স্যার খুশি হতেন ?

রফিকুল জবাব দিল না। আসাদ বলল, তিনি আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করার পর তার সেই মৃত্যুকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেউ তাকে এতবড় একটা পুরস্কার দিবেন, এটি শুনলে তিনি খুশি হতেন ?

রফিকুল এবারও জবাব দিল না। আসাদ বলল, ওই পুরস্কারের গায়ে এটা লেখা থাকবে না যে 'আজিজুর রহমান, মরণোত্তর' ?

জি, তা তো থাকবেই। মৃত্যুর পরে পুরস্কার পেলে তো মরণোত্তরই লেখা থাকবে। সেটাই তো স্বাভাবিক।

ওটা কেটে একটা শব্দ লিখে দিতে বলতে পারবেন ?

কী শব্দ ?

মরণোত্তম।

মরণোত্তম ?

হুম।

মরণোত্তম মানে কী ?

মরণোত্তম মানে যেখানে জীবনের চেয়ে মৃত্যু উত্তম। যেখানে জীবিত মানুষটির চেয়ে মৃত মানুষটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেখানে মরণই তো উত্তম। কি উত্তম না ?

রফিকুল জবাব দিল না। তবে আসাদ আবারও থুথু ফেলল। একদলা থকথকে থুথু। থুথুটুকু পড়েছে ঘাসের ওপর। থকথকে গা ঘিনঘিনে একদলা থুথু। ততক্ষণে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। তারা দুজনই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই গা ঘিনঘিনে থুথুটুকুর দিকে। এই বুঝি বৃষ্টিতে ওই গা ঘিনঘিনে থকথকে থুথুটুকু ধুয়ে যায়! ০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~